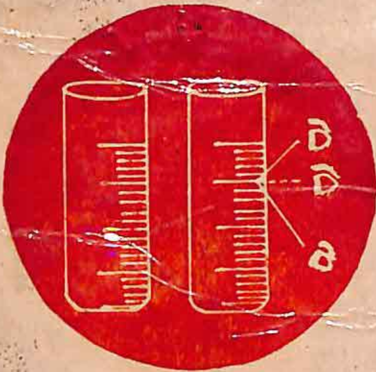
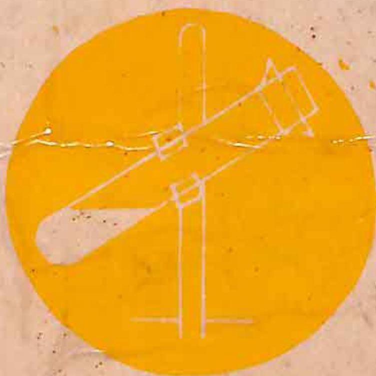
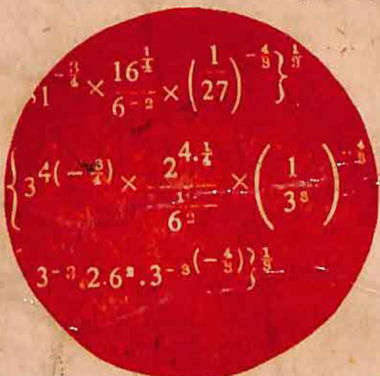
বিনয় দত্ত

বিজ্ঞানের মজা

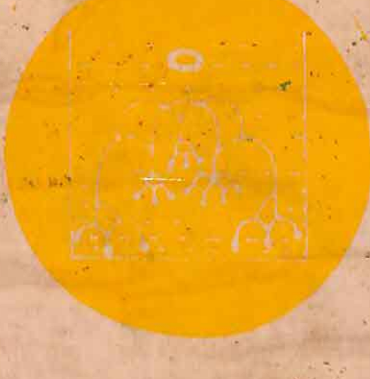
পদার্থবিদ্যা













বিজ্ঞানের মজা

পদার্থ বিদ্যা

বিনয় দত্ত

জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট, কলি-৭৩

Bigganer Maja (Physical Science)
By Sri Binoy Dutta.
Price Rs. 20/-

প্রথম প্রকাশ :
জুন, ১৯৮৭

প্রকাশক :
দিলীপ চক্রবর্তী
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

ভেতরের ছবি : মীনা মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
গণেশকুমার ভাণ্ডারী
লক্ষ্মী প্রিণ্টার্স
২১/১ বি, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মূল্য—কুড়ি টাকা

বিজ্ঞানের মজা : পদার্থ বিদ্যা

বিজ্ঞান এক অন্বেষণ! মানুষকে এই মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করতে হবে। আর এই মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করাই হল বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আবিষ্কারগুলির সঠিক ব্যবহার শুধু যে মানুষের সুখ-সুবিধা বাড়ায় তাই নয়, ভবিষ্যতে একদিন বিজ্ঞান মানুষের কর্মশক্তি, বুদ্ধি, প্রতিভা, স্মরণশক্তি হৃদয়বত্তা ইত্যাদি শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি গুলিকেও অনেক উন্নত করে প্রতিটি মানুষের জীবনকে আরও অনেক সুন্দর, সমৃদ্ধ আনন্দময় করে গড়ে তুলবে।

তোমাদের মনে এই বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্যই এই বই। এখানে পদার্থ বিজ্ঞানের কয়েকটি মজার পরীক্ষা বলা হয়েছে আর সেই সঙ্গে আছে কিছু আকর্ষনীয় প্রশ্ন ও তার উত্তর।

তবে বিজ্ঞানের বই পড়ে কেবল মজা পেলেই হবে না সেই সঙ্গে প্রকৃতির রহস্যকে ও জানতে হবে। এই কথা মনে রেখে এই বইয়ে প্রতিটি পরীক্ষা ও প্রশ্নের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এমন ভাবে বোঝানো হয়েছে যাতে অতি সহজেই তা তোমাদের বোধগম্য হয়।

বিজ্ঞানের জগৎ যেন এক স্বপ্নের জগৎ! তাহলে চল আমরা বেড়িয়ে আসি বিজ্ঞানের সেই স্বপ্নের জগৎ থেকে! আর তাতে তোমরা আনন্দ পেলে আমারও আনন্দ!

লেখক

১.৬.৮৭

এই মহাবিশ্বের শাশ্বত রহস্য এর বোধগম্যতা (The eternal mystery of the world is its comprehensibility.)

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

বিজ্ঞানের মজা (রসায়ন)

বিজ্ঞানের মজা (অংক)

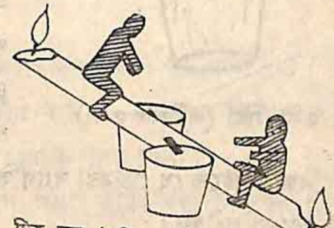
সূচীপত্র

পরীক্ষা

১। মোমবাতির খেলা !

প্রয়োজন ঃ একটি বড় মোমবাতি, একটি সূচ বা সরু পেরেক, দুটি সমান গ্লাস ও কিছু মোটা কাগজ।

পদ্ধতি ঃ মোমবাতির যে দিক মাটিতে বসান থাকে সেই দিক থেকে কিছু মোম কেটে পলতে বার করে নাও, এর ফলে মোমটা দুদিকেই জ্বলতে পারবে। মোমটার মাঝখানে একটা সূচ বা পেরেক বিঁধিয়ে দাও। সমান গ্লাস দুটো পাশাপাশি রেখে মোমে বেঁধা সূঁচটা তাদের উপর রাখ। মোমটা এমনভাবে রাখ যাতে একদিক একটু উঁচু আর একদিক একটু নীচু হয়ে থাকে, প্রয়োজন হলে একদিক থেকে একটু মোম কেটে বাদ দাও। এখন মোমটার উভয় দিকই জ্বালিয়ে দাও। দেখবে বাতিটা ক্রমাগত ওঠানামা করতে থাকবে (চিত্র ১)।



চিত্র এক (পরীক্ষা এক)

ব্যাখ্যা ঃ মোমবাতির যে দিক নীচে ঝুলে আছে সেই দিক শিখার সংস্পর্শ বেশী পায় বলে সেই দিকের মোম গলার হার বেশী। এতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দিক হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যায়। তখন আবার অপর দিকের মোম বেশী পরিমাণে গলতে আরম্ভ করে। এর ফলে মোমটা পর্যায়ক্রমে ওঠানামা করতে থাকে।

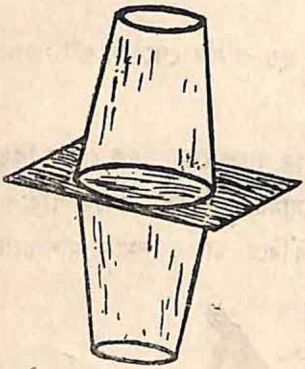
মোটা কাগজ কেটে দুটো মানুষের মূর্তি তৈরি করে মোমবাতির দুপাশে বসিয়ে দিলে খেলাটা আরও মজার লাগবে।

২। নীচের গ্লাস পড়ে যায় না কেন ?

প্রয়োজন ঃ দুটো সমান মাপের কাচের গ্লাস ও একটি ব্লটিং পেপার।

পদ্ধতি ঃ দুটো গ্লাসকে গরম করা হল, ভিতরে জ্বলন্ত কাগজ ফেলে বা অন্য যেভাবেই হোক গরম করলেই হবে। এবার ব্লটিং পেপারটা জলে ভিজিয়ে একটা গ্লাসের উপর রাখ। সঙ্গে সঙ্গে অপর গ্লাসটি উপুড় করে ব্লটিং পেপারের উপর

চেপে বসিয়ে দাও। উপরের গ্লাসের কিনারা যেন ঠিক নীচের গ্লাসের কিনারার উপর থাকে। এখন উপরের গ্লাসটি টেনে তুললেই ব্লটিং পেপার সমেত নীচের গ্লাসটিও উঠে আসবে (চিত্র ২)।



২ নং চিত্র (পরীক্ষা ২ নং)

ব্যাখ্যা ঃ গ্লাস গরম করার ফলে ভিতরের বাতাস হাল্কা হয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। ফলে গ্লাসের ভিতরের বাতাসের চাপ কমে যায়, কাজেই বাইরের বাতাসের উর্ধ্বচাপের প্রভাবে নীচের গ্লাস পড়ে যায় না। ভিজে ব্লটিং পেপার থাকার জন্য গ্লাস দুটির মুখ বায়ুনিরুদ্ধভাবে আটকে থাকে। এর ফলে বাইরের বাতাস ভিতরে ঢুকে ভিতরের বাতাসের চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে না।

বিজ্ঞান বইতে যে তোমরা ম্যাগডিবার্গ অর্ধগোলকের পরীক্ষা পড়েছ এটা হল সেই ধরনের পরীক্ষা।

মনে রাখবে গ্লাসের ভিতরে জ্বলন্ত কাগজ ফেলার ফলে অক্সিজেন ফুরিয়ে যায় আর গ্লাসের ভিতরের চাপ কমে যায় এই ধারণা ভুল। কারণ অক্সিজেন ফুরিয়ে গেলেও সমায়তন কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, ফলে চাপ একই থাকে।

৩। ইচ্ছামত সুতো ছেঁড়া !

প্রয়োজন ঃ কিছু সুতা ও একটি ভারী বই।

পদ্ধতি ঃ সুতো দু টুকরো কর। এক টুকরো দিয়ে বইটা বেঁধে উপর থেকে ঝুলিয়ে দাও। অপর টুকরো বইয়ের নীচের দিকে আগের সুতোর সঙ্গে বাঁধ।

এবার তোমার বন্ধুকে বল সে সুতোর নীচের প্রান্ত টেনে খুশিমত সুতোটা বইয়ের উপরে বা নীচে ছিঁড়তে পারে কিনা? (চিত্র ৩)



চিত্র তিন (পরীক্ষা তিন)

কৌশল ঃ সুতো বইয়ের উপরে ছিঁড়তে হলে সুতোর নীচের প্রান্ত ধরে

ধীরে ধীরে টান। আর বইয়ের নীচে ছিঁড়তে চাইলে সূতোর নীচের প্রান্তে হ্যাঁচকা টান দাও।

ব্যাখ্যা ঃ হ্যাঁচকা টান মারলে স্থিতিজাড্যের জন্য ভারী বইয়ের গতি হয় খুব কম, ফলে উপরের সূতো খুব কম প্রসারিত হয়, পক্ষান্তরে নীচের সূতো বেশী প্রসারিত হওয়ায় ছিঁড়ে যায় এমনকি তা বেশী মোটা হলেও।

কিন্তু ধীরে ধীরে টানলে উপরের সূতো ছিঁড়ে যায় কারণ বইয়ের ওজন ও হাতের টান উভয় বলই উপরের সূতোকে নীচের দিকে টানে, পক্ষান্তরে নীচের সূতোকে শুধু হাতের টান নীচের দিকে টানে।

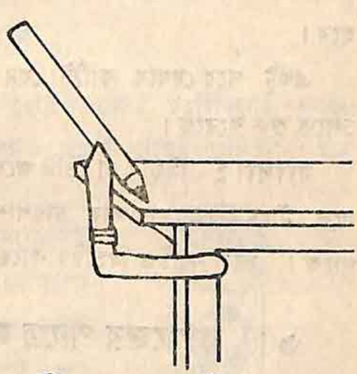
৪। পেন্সিলের নাচ!

প্রয়োজন ঃ একটি পেন্সিল ও একটি ভাঁজ করা যায় এমন ছুরি।

পদ্ধতি ঃ একটি পেন্সিল সরু করে কাট। সবাইকে জিজ্ঞাসা কর কেউ পেন্সিলটা সরু শীষের উপর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে কিনা?

কৌশল ঃ ছুরিটা সমকোণে খোল অর্থাৎ ছুরির ফলা ও হাতল পরস্পরের সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোণ করে থাকবে। ফলাটা পেন্সিলের ডগার কাছে বিঁধিয়ে দাও। এখন পেন্সিলটাকে শীষের উপর ভর করে টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে দাও। প্রয়োজন হলে ছুরির ফলা ও হাতলের মাঝের কোণ সামান্য বাড়াও বা কমাও।

পেন্সিলটা ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে এমনকি একটু-আধটু নাড়িয়ে দিলেও পড়ে যাবে না (চিত্র ৪)।



চিত্র নং 4 (পরীক্ষা নং 4)

ব্যাখ্যা ঃ কোন বস্তুকে একটিমাত্র বিন্দুর উপর ভর করে সাম্যাবস্থায় (equilibrium) দাঁড়িয়ে থাকতে হলে বা একটিমাত্র বিন্দু থেকে সম্যাবস্থায় ঝুলে থাকতে হলে এই বিন্দু ও ঐ বস্তুর ভারকেন্দ্রকে (যে বিন্দুতে কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল কাজ করে তাকে বলে ঐ বস্তুর ভারকেন্দ্র) অবশ্যই একই উল্লম্ব (খাড়া) রেখায় থাকতে হবে। এছাড়া বস্তুর ভারকেন্দ্র যত নীচে থাকবে সাম্যাবস্থা তত স্থায়ী হবে।

শুধু পেন্সিলকে শীষের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না কারণ শীষের অগ্রবিন্দু ও পেন্সিলের ভারকেন্দ্র একই উল্লম্ব রেখায় রাখা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। এছাড়া এক্ষেত্রে পেন্সিলের ভারকেন্দ্র থাকে অনেক উপরে।

পেন্সিলে ছুরি বেঁধালে সমস্ত (পেন্সিল ও ছুরি) জিনিষটার ভারকেন্দ্র চলে আসে অনেক নীচে, কারণ ছুরি পেন্সিলের চেয়ে অনেক ভারী। এছাড়া কয়েক-বার দোল খাবার পর ভারকেন্দ্র শীষের অগ্রবিন্দুর ঠিক নীচে (অর্থাৎ একই উল্লম্ব রেখায়) চলে আসে, ফলে ছুরি বেঁধা পেন্সিল শীষের উপর স্থায়ী সাম্যাবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে।

৫। মিষ্টিপ্রিয় কাঠি!

প্রয়োজন ঃ একটি দেশলাই কাঠি, একটি বড় বাটি, সুতো এবং মিছরি বা চিনি।

পদ্ধতি ঃ বাটি জলে ভর্তি কর। দেশলাই কাঠিটা বাটির মাঝখানে ভাসাও। এক টুকরো মিছরি সুতোয় বেঁধে বাটির জলে অর্ধেক ডুবিয়ে রাখ। মিছরি কাঠি থেকে তিন-চার সেন্টিমিটার দূরে থাকবে। জল যেন শান্ত থাকে। মিছরি না পেলে কিছু চিনি কাপড়ে বেঁধে সুতো দিয়ে জলে ঝুলিয়ে রাখলেও হবে।

একটু পরে দেখবে কাঠিটা যেন মিষ্টির লোভে ধীরে ধীরে মিছরির দিকে চলতে সুরু করেছে।

ব্যাখ্যা ঃ মিছরি বা চিনি জলে দ্রবীভূত হলে এই দ্রবণ জলের চেয়ে ভারী বলে নীচে নেমে যায় আর চারপাশ থেকে হাল্কা জল মিছরির কাছে আসতে থাকে। ফলে কাঠিও মিছরির কাছে চলে আসে।

৬। কাগজের পাত্রে জল গরম করা।

প্রয়োজন ঃ কাগজ, ক্লিপ, জল এবং গরম করার ব্যবস্থা।

পদ্ধতি ঃ কোন জিনিষ গরম করতে হলে আমরা এমন পাত্র ব্যবহার করি যা আগুনে পোড়ে না, যেমন পেতল বা স্টিলের পাত্র। কিন্তু কাগজের মত সহজদাহ্য পদার্থে তৈরি পাত্রতেও কি কোন কিছু গরম করা যায়? হ্যাঁ যায়, যদিও এটা আমাদের কাছে অসম্ভব মনে হয়। এই পরীক্ষাতেই তা প্রমাণ হবে।

একটা কাগজ ভাঁজ করে চারকোণা একটা পাত্র প্রস্তুত কর। পাত্রটাকে ক্লিপ দিয়ে বা এমন আঠা দিয়ে আটকাও যাতে জল ঢাললে বা গরম করলে না খোলে। এবার পাত্রে জল ভর্তি করে সেটা একটা স্ট্যাণ্ডের উপর বসিয়ে গরম কর। স্ট্যাণ্ডের উপর একটা সরু তারের জাল রেখে তার উপর পাত্রটা বসালে ভাল হয়, কারণ তাহলে জলে ভিজে পাত্রের তলা ফেঁসে যাওয়ার ভয় থাকে না।

একটু পর দেখবে জল ফুটে বাষ্প বেরোচ্ছে কিন্তু কাগজের পাত্র একটুও পোড়েনি।

ব্যাখ্যা ঃ কোন দাহ্য পদার্থ পুড়বার জন্য তার উষ্ণতা একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সমান বা বেশী হওয়া চাই। অর্থাৎ বস্তুর তাপমাত্রা সেই নির্দিষ্ট তাপ-মাত্রার কম হলে তা কিছুতেই আগুনে পুড়বে না। আমরা জানি (সাধারণ বায়ুচাপে) জলের স্ফুটনাঙ্ক ১০০° সেলসিয়াস। সুতরাং পাত্রের জলের উষ্ণতা কখনও ১০০° সেলসিয়াসের বেশী হতে পারে না। এখন কাগজ পাতলা বলে, তার তাপ পরিবহণ ক্ষমতা কম হলেও, কাগজের মধ্য দিয়ে তাপ দ্রুত গতিতে জলের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। সেই জন্য কাগজের উষ্ণতাও ১০০° সেলসিয়াসের বেশী হতে পারে না। কিন্তু উষ্ণতা অনেক বেশী না হলে কাগজ পোড়ে না, সেই জন্যই এখানে জল ফুটলেও কাগজের পাত্রটা পোড়ে না।

৭। ইচ্ছামত মাছের ওঠা নামা!

প্রয়োজন ঃ একটি বড় মুখওয়ালা বোতল যেমন হরলিকসের বোতল. একটি রাবারের বেলুন, দু-একটি রাবার ব্যাণ্ড, একটি কাচের ছোট ফাঁপা মাছ ও একটু ভেসেলিন।

পদ্ধতি ঃ তুমি কিছু জলভর্তি (মুখ বাঁধা) একটি কাচের বোতল টেবিলের উপর রাখলে। বোতলের ভিতর একটি মাছ ভাসছে। মাছটাকে ডুবতে বললেই ডুবছে আবার ভেসে উঠতে বললেই ভেসে উঠছে। এরকম যতবার বলবে ততবারই মাছটা করবে।



চিত্র নং ৬ (পরীক্ষা নং 7)

প্রস্তুতি ঃ কাচের কারখানা থেকে একটা ফাঁপা কাচের মাছ তৈরি করে আনো। মাছের লেজের দিক নিরেট আর মাথার দিক ফাঁপা হতে হবে। এর লেজের দিকে একটা সরু

নলের মত ছিদ্র থাকবে যা দিয়ে বাইরে থেকে ভিতরের ফাঁপা অংশে জল চলাচল করতে পারে। মাছটার লেজের দিক নিরেট সুতরাং ভারী বলে ওটা খাড়া হয়ে ভেসে থাকতে পারে (চিত্র ৫)।

বোতলের চার ভাগের তিন ভাগ জলে ভর্তি করে মাছটা জলে ছেড়ে দাও। মাছ খাড়া হয়ে ভাসবে। মাছের অনেকটা অংশ জলের উপর বেরিয়ে থাকলে ড্রপারের সাহায্যে বা জলের কলের নীচে ধরে ওর ভিতরে কিছু জল ঢোকাও যাতে মাছটা জলের উপর সামান্য একটু মাত্র ভেসে থাকে। এখন বোতলের মুখের কাছে বাইরের গায়ে একটু ভেসেলিন লাগিয়ে মুখটা বেলুন দিয়ে ঢেকে রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে বেঁধে দাও। ভেসেলিন লাগাচ্ছ যাতে বোতলের ভিতর বাইরে থেকে বায়ু চলাচল করতে না পারে।

এবার বোতলের মুখের বেলুনের উপর হাত দিয়ে চাপ দিলেই মাছটা জলের নীচে নেমে যাবে আর চাপ সরিয়ে দিলেই জলের উপর ভেসে উঠবে। যারা জানে না তারা ভাববে মাছটা যেন তোমার কথামতই ওঠানামা করছে।

মাছের বদলে ডুবুরিও ব্যবহার করতে পার, এমনকি সাধারণ কাচের ড্রপারও ব্যবহার করা যায়। এই খেলাটি বিজ্ঞানী দেকার্তে আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে একে কার্টেজীয় ডুবুরিও (Cartesion Diver) বলা হয়।

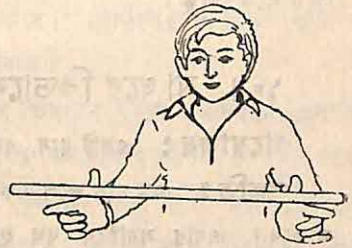
ব্যাখ্যা ঃ রাবারের পর্দায় চাপ দিলে বোতলের ভিতর জলের উপরের বাতাসের উপর চাপ পড়ে। তখন পাস্কালের সূত্রানুযায়ী বাতাস চাপ দেয় জলের উপর, আর জল চাপ দেয় মাছের ভিতরের বাতাসের উপর। (মাছের ভিতরে কিছু বাতাস থাকতেই হবে।) ফলে মাছের ভিতরের বাতাস কিছুটা সঙ্কুচিত হয় আর মাছের ভিতরে জল প্রবেশ করে। এতে মাছের ওজন সমায়তন জলের ওজনের চেয়ে বেশী হয় এবং আর্কিমিডিসের সূত্রানুযায়ী মাছ জলে ডুবে যায়। পর্দা থেকে চাপ সরিয়ে নিলে মাছের ভিতরের অতিরিক্ত জল বেরিয়ে আসে। মাছের ওজন সমায়তন জলের ওজনের চেয়ে কমে যায়, ফলে মাছটা আগের মত ভেসে ওঠে। মাছ জলের যত বেশী নীচে নামবে মাছের ছিদ্রের বাইরের জলের চাপও তত বৃদ্ধি পাবে, কারণ তরলের চাপ গভীরতার উপর নির্ভর করে। ফলে মাছের ভিতরে জলও বেশী ঢুকবে। এমন হতে পারে যে এই অবস্থায় পর্দাকে চাপমুক্ত করার ফলে কিছু জল বেরিয়ে গেলেও মাছের ওজন সমায়তন জলের ওজনের চেয়ে বেশীই থেকে যাচ্ছে, ফলে মাছ আর ভেসে উঠছে না। এই ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

৮। লাঠি কোন্ দিকে পড়বে ?

প্রয়োজন ঃ একটি লম্বা সরু লাঠি।

পদ্ধতি ঃ দুই হাতের তর্জনীর উপর লাঠিটি রাখ। লাঠির এক প্রান্ত আঙুল থেকে যতটা বেরিয়ে থাকবে অন্য প্রান্ত আঙুল থেকে তার চেয়ে কিছু বেশী বেরিয়ে থাকবে। এবার সবাইকে জিজ্ঞসা কর দুই হাতের তর্জনী ধীরে ধীরে কাছাকাছি আনলে লাঠি কোন্ দিকে পড়বে ? সবাই নিশ্চয়ই জানাবে লাঠির যেদিক তর্জনী থেকে বেশী বেরিয়ে আছে সেই দিকেই লাঠি পড়ে যাবে।

কিন্তু দুই হাতের তর্জনী কাছাকাছি আনলেও দেখা যাবে লাঠি কোন দিকেই পড়ছে না। এটা খুবই বিস্ময়ের। (চিত্র নং ৬)।



চিত্র নং 6 (পরীক্ষা নং ৪)

ব্যাখ্যা ঃ তোমার যে আঙুল লাঠির ভারকেন্দ্র থেকে দূরে সেই আঙুলের উপর লাঠির চাপ কম পড়ে। চাপ কম হলে ঘর্ষণও কম হয় আর ঘর্ষণ কম হলে গতিও বেশী হয়। ফলে দু হাত কাছাকাছি আনার চেষ্টা করলে যে তর্জনী লাঠির ভারকেন্দ্র থেকে দূরে শুধু সেই তর্জনীই অন্য দিকে অগ্রসর হয়।

আবার গতিশীল আঙুল অন্য আঙুলের তুলনায় লাঠির ভারকেন্দ্রের কাছে চলে এলে গতি বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্য আঙুলটা গতিশীল হয়।

যে কোন মুহূর্তে একটি মাত্র আঙুল গতিশীল হয় বলে (যে আঙুল লাঠির ভারকেন্দ্র থেকে দূরে শুধু সেই আঙুল) দুটো তর্জনী যখন মিলিত হয় তখন ভারকেন্দ্র ঠিক তর্জনীদুয়ের মাঝখানে থাকে। ফলে ব্যাল্যান্স ঠিক থাকে আর লাঠিও পড়ে যায় না (যদি কোন বস্তুর ভারকেন্দ্র তার অবলম্বনের সীমারেখার অভ্যন্তরে থাকে তবে বস্তুটি সাম্যাবস্থায় থাকে)।

৯। কিভাবে গিঁট দেবে ?

প্রয়োজন ঃ একটি দড়ি।

পদ্ধতি ঃ একটা দড়ি নিয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসা কর, কেউ দড়িটার দুই প্রান্ত

দুই হাতে মুঠো করে ধরে হাতের মুঠো না খুলে দড়ির মধ্যে একটা গিঁট দিতে পারে কিনা।



চিত্র সাত (পরীক্ষা নয়)

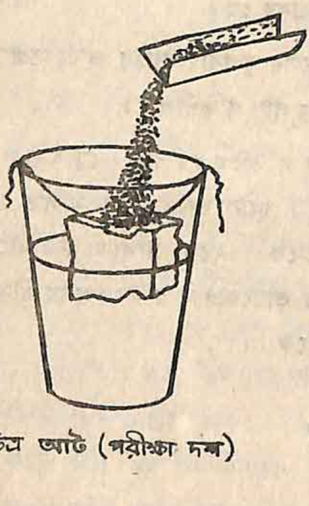
কৌশল : তোমার হাত দুটো ছবির মত (চিত্র ৭) করে মুড়ে নাও। এবার দুই হাত দিয়ে দড়ির দুই প্রান্ত মুঠো করে ধর। এখন মোড়া হাত দুটো খুলে স্বাভাবিক অবস্থায় আনলেই দেখতে পাবে দড়ির মাঝখানে একটা গিঁট পড়ে গেছে।

১০। না ধরে কিভাবে বরফ তুলবে ?

প্রয়োজন : একটি গ্লাস, এক টুকরো বরফ, কিছু লবণ আর একটু সুতো।

পদ্ধতি : এক গ্লাস জলে এক টুকরো বরফ ফেলে দাও, বরফ জলে ভাসতে থাকবে। এবার সবাইকে বল হাত বা চামচ দিয়ে না ধরে কেউ বরফটা জল থেকে তুলতে পারবে কিনা।

কৌশল : একটা সুতো ছবির মত (চিত্র ৮) করে বরফটার উপর রাখ। খানিকটা লবণ এনে বরফের উপর এমনভাবে ছড়িয়ে দাও যাতে সুতোটা লবণের নীচে ঢাকা পড়ে যায়। কয়েক মিনিট পরে দেখবে সুতোটা বরফের সঙ্গে শক্তভাবে এঁটে গেছে। এখন সুতোর যে কোন প্রান্ত ধীরে টানলেই বরফটা সুতোর সঙ্গে উঠে আসবে।



চিত্র আট (পরীক্ষা দশ)

ব্যাখ্যা : লবণ মেশালে বরফের উষ্ণতা 0° সেলসিয়াসের চেয়ে অনেক কমে যায়। আবার লবণ দিলে সুতোর চারপাশের কিছু বরফ গলতে সুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের ঠাণ্ডা বরফ এই জলের তাপ শোষণ করে নেয়,

ফলে সুতোর চারপাশের জল আবার জমে গিয়ে বরফে পরিণত হয়। কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যে সুতোটা বরফের ভেতরে আটকে যায়।

১১ ॥ বোতলের ভিতর কি ডিম ঢুকতে পারে ?

প্রয়োজন ঃ একটি খোসা ছাড়ানো সেদ্ধ ডিম ও একটি দুধের বোতল।

পদ্ধতি ঃ বোতল আর ডিম দেখিয়ে সবাইকে বল কেউ বোতলের ভিতর ডিমটা ঢোকাতে পারে কিনা ?

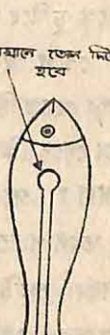
কৌশল ঃ বোতলটা গরম কর। ('নীচের গ্লাস পড়ে যাচ্ছে না কেন' দেখ)। বোতলের মুখে ডিম বসিয়ে দাও, সরু দিকটা যেন নীচে থাকে। ডিমটা আস্তে আস্তে বোতলের ভিতর ঢুকে যাবে। বোতলের অতটুকু ছোট মুখ দিয়ে ডিমটাকে ঢুকতে দেখে সবাই তো অবাক !

ব্যাখ্যা ঃ বোতল গরম করার ফলে ভিতরের বাতাস আয়তনে প্রসারিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। বোতলের মুখে ডিম থাকার ফলে ঠাণ্ডা হবার পরেও বাইরের বাতাস আর বোতলের ভিতর ঢুকতে পারে না। ফলে বোতলের ভিতরের বাতাসের চাপ কমে যায় আর বাইরের বাতাসের চাপে ডিমটা বোতলের ভিতর ঢুকে যায়।

১২। কাগজের মাছ চলছে !

প্রয়োজন ঃ একটি মোটা কাগজ বা পোস্টকার্ড এবং যে কোন খাবার তেল।

পদ্ধতি ঃ পোস্টকার্ড থেকে একটা মাছের মত আকৃতি কেটে নাও। মাছের পেটের মাঝখানে একটা ছিদ্র কর। এবার মাছের লেজ থেকে এই ছিদ্র পর্যন্ত সরু এক ফালি কাগজ কেটে বাদ দাও (চিত্র ৯)। যে কোন বড় পাত্রে জল ঢেলে মাছটা তার মধ্যে ছেড়ে দাও। মাছটা জলের উপর ভাসতে থাকবে। এখন ছিদ্রের মধ্যে এক ফোঁটা তেল ফেলে দিলেই দেখবে মাছটা সামনের দিকে চলতে সুরু করেছে।



চিত্র নয় (পরীক্ষা বার)

মোটর গাড়ি যেমন পেট্রোলের শক্তিতে এগিয়ে চলে মাছটাও যেন তেমনি তেলের শক্তিতে এগিয়ে চলেছে !

ব্যাখ্যা : তেল জলের চেয়ে হাল্কা বলে জলের উপর ভাসে। আবার যে কোন তরল পদার্থের উপর অপর কোন তরল পদার্থ ঢাললে তল-টানের জন্য উপরের তরলটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ('লোহাও জলে ভাসে' দেখ)। সুতরাং ছিদ্রের মধ্যে তেল দিলেই তেল সবদিকে ছড়িয়ে পড়তে চায়, ফলে তেল ছিদ্রের মধ্যে লেজের দিক ছাড়া অন্য সব দিকেই মাছের গায়ে চাপ দেয় বাঁ দিকের আর ডানদিকের চাপ বিপরীত দিকে কাজ করার ফলে কাটাকুটি হয়ে যায়। আর মাথার দিকের চাপে মাছটা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। জেট প্লেনও একই কারণে গ্যাসের ধাক্কায় এগিয়ে যায়। একাধিক বার এই খেলাটা দেখাতে হলে প্রতিবার দেখাবার আগে পাত্রের জল পালটে নেবে।

১৩। লোহাও জলে ভাসে !

প্রয়োজন : একটি সূচ, একটু তেল, এক পাত্র জল আর একটি কাঁটা চামচ বা একটি ব্লটিং পেপার।

পদ্ধতি : সবাইকে জিজ্ঞাসা কর তাদের মধ্যে কেউ সূচটাকে জলে ভাসাতে পারে কিনা।

কৌশল : সূচটাকে ভালভাবে শুকিয়ে নাও। তারপর সূচটাকে একটু তেল মাখিয়ে একটা কাঁটা চামচের উপর রেখে পাত্রের জলের মধ্যে কাঁটাটিকে আস্তে আস্তে ডুবিয়ে দাও। দেখবে সূচটা জলের উপর ভেসে থাকছে। কাঁটা চামচ না পেলে সূচটাকে ব্লটিং পেপারের উপর রেখে ব্লটিং পেপারটা সাবধানে জলের উপর ছেড়ে দিতে হবে। একটু পরে লক্ষ্য করবে ব্লটিং পেপারটা জলে ভিজে ডুবে গেছে কিন্তু সূচটা জলে ভেসে আছে।

ব্যাখ্যা : জলের তল-টান বা সারফেস টেনসানের জন্যই সূচটা জলে ভেসে থাকে। তরল পদার্থের মুক্ততলে একটি বল কাজ করে যার ফলে তরলের মুক্ততল সর্বদা সঙ্কুচিত হতে চায়। একেই বলে তল-টান। তল-টানের জন্য তরলের মুক্ততল একটা খুব পাতলা পর্দার মত ব্যবহার করে। এই পর্দা সবসময় তার ক্ষেত্রফল সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করে।

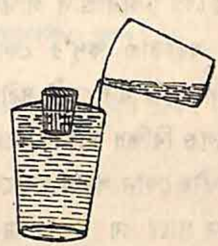
সূচটা জলের উপর রাখলে সূচের নীচের জলতল নীচের দিকে একটু বেঁকে যায়, ফলে জলের তলের ক্ষেত্রফল বেড়ে যায়। তলের ক্ষেত্রফল সর্বদা কম থাকতে চায়।

সুতরাং সূচের নীচের জলতলের বক্র অংশ সোজা হতে চায় এবং সোজা হতে গিয়ে সূচের উপর উর্ধ্বদিকে একটা বল প্রয়োগ করে। ফলে সূচটা ভেসে থাকে।

১৪। কর্কটাকে মাঝখানে রাখতো !

প্রয়োজন ঃ একটি গ্লাস ও একটি কর্ক।

পদ্ধতি ঃ গ্লাসের প্রায় সবটা জলে ভর্তি করে তাতে কর্কটা ছেড়ে দাও। দেখবে কর্কটা গ্লাসের এক পাশে ভেসে আছে। এবার তোমার বন্ধুদের বল তারা কর্ক বা গ্লাসটাকে স্পর্শ না করে জলের ঠিক মাঝখানে কর্কটা ভাসিয়ে রাখতে পারে কিনা ?


চিত্র দশ (পরীক্ষা চৌদ্দ)

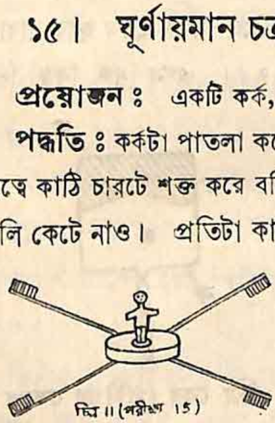
কৌশল ঃ অন্য একটা পাত্র থেকে একটু একটু করে জল ঢেলে গ্লাসটা কানায় কানায় জলে ভর্তি কর। দেখবে কর্কটা ধীরে ধীরে গ্লাসের জলের মাঝখানে গিয়ে স্থির হয়ে আছে (চিত্র ১০)।

ব্যাখ্যা ঃ গ্লাসটা কানায় কানায় জলপূর্ণ করলে তল-টানের জন্য জলের উপরিতল মাঝখানটায় একটু উঁচু হয়ে থাকে আর কর্কটা জলতলের ঠিক মাঝখানে চলে যায়।

১৫। ঘূর্ণায়মান চক্র !

প্রয়োজন ঃ একটি কর্ক, চার টুকরো কর্পূর আর চারটে কাঠি।

পদ্ধতি ঃ কর্কটা পাতলা করে কেটে নাও। কর্কের এই চাকতিটার গায়ে সমান দূরত্বে কাঠি চারটে শক্ত করে বসিয়ে দাও। এবার কর্ক থেকে আরও চারটে পাতলা ফালি কেটে নাও। প্রতিটা কাঠির মাথায় একটা করে কর্কের ফালি খাড়াভাবে


চিত্র ।। (পরীক্ষা 15)

ঢুকিয়ে বসিয়ে দাও। এখন কাঠির মাথায় আটকানো প্রত্যেকটা কর্কের ফালিতে জলে গলে না এমন ভাল আঠা দিয়ে একটা করে কর্পূরের টুকরো আটকে দাও। কর্পূরের টুকরোগুলো চারটে কাঠিরই একদিকে লাগাতে হবে। এবার একটা চক্র তৈরি হল। এই চক্রটাকে এক পাত্র জলের উপর আস্তে করে ছেড়ে দাও। চক্রটা

যেন যথাসম্ভব হাল্কা হয়। এখন চক্রটা জলের উপর পাক খেয়ে ঘুরতে আরম্ভ করবে (চিত্র ১১)। কাগজ কেটে একটা মূর্তি তৈরি করে সেটা চক্রের মাঝখানে বসিয়ে দিলে খেলাটা আরও ভাল লাগবে।

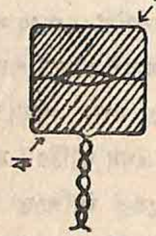
ব্যাখ্যা ঃ কর্পূর ধীরে ধীরে জলে গলতে থাকে। কর্পূর জলে দ্রবীভূত হলে সেই জলের তল-টান কমে যায় অর্থাৎ সাধারণ জলের চেয়ে কর্পূরের দ্রবণের তল-টান কম। সুতরাং কর্পূরের চারপাশের জলের তল-টান দূরের জলের তল-টানের চেয়ে কমে যায়। তলটানের এই পার্থক্যের জন্যই কর্পূরের টুকরোগুলি গতিশীল হয় এবং চক্রটা ঘুরতে থাকে।

এছাড়াও কর্পূর কোথাও ধীরে ধীরে দ্রুত গতিতে দ্রবীভূত হয়। যেই জলে কর্পূর যত বেশী দ্রবীভূত হয় সেই জলের তল-টান তত বেশী কমে। এর ফলেও বিভিন্ন স্থানের জলের তল-টান বিভিন্ন হয়। জলে আগে থেকেই তেল জাতীয় কোন পদার্থ থাকলে জলের তল টান কমে যাবে। সেই ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে কর্পূর দ্রবীভূত হওয়ার পর তল টান আর কমল না। তাহলে কিন্তু চক্র ঘুরবে না।

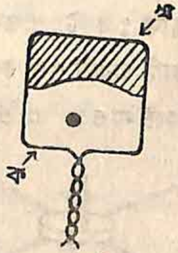
১৬। তরলের তলটানের পরীক্ষা

প্রয়োজন ঃ একটি সরু তার, একটু সাবান-জল আর একটু সুতো।

পরীক্ষা ঃ সরুতার বাঁকিয়ে একটা চারকোণা ফ্রেম তৈরি কর। ফ্রেমের মাঝ বরাবর আলগা করে সুতো বেঁধে দাও। সুতোটার মাঝখানে একটা ফাঁস থাকবে। এবার ফ্রেমটা সাবান-জলে ডুবিয়ে নিলে সমস্ত ফ্রেম জুড়ে সাবান-জলের একটা পাতলা পর্দা সৃষ্টি হবে (চিত্র ১২)। এখন সরু কিছু দিয়ে



চিত্র বার (পরীক্ষা খোল)

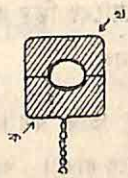


চিত্র তের (পরীক্ষা খোল)

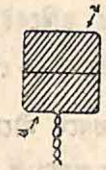
পর্দার ক অংশ ছিঁড়ে দাও। দেখবে খ অংশের পর্দা সুতোটাকে ভিতর দিকে টেনে নিয়ে বৃত্তচাপের আকারে টান করে ধরে রেখেছে (চিত্র ১৩)।

ক্রেমটা আবার সাবান-জলে ডুবিয়ে সুতোর ফাঁসের ভিতরের পর্দা ছিঁড়ে ফেল। ফাঁসটা এবার গোল হয়ে টান হয়ে থাকবে (চিত্র ১৪)।

এখন সুতো খুলে নিয়ে ফ্রেমটা সাবান-জলে ডুবিয়ে পর্দা তৈরি কর। ফ্রেমটা

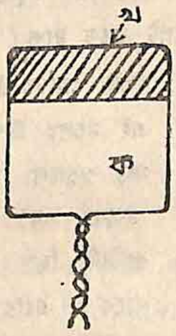


চিত্র চৌদ্দ (পরীক্ষা ষোল)



চিত্র পনেরো(পরীক্ষা ষোল)

মাটির সমান্তরাল ভাবে ধরে ফ্রেমের মাঝ বরাবর একটা সরু তার রাখ (চিত্র



চিত্র ষোল (পরীক্ষা ষোল)

১৫)। ক অংশের পর্দা ছিঁড়ে ফেল। তারটা সরে গিয়ে খ অংশের পর্দার আয়তন কমে যাবে (চিত্র ১৬)।

ব্যাখ্যা ঃ 'লোহাও জলে ভাসে' পরীক্ষায় জেনেছ তরলের পদার্থের তল-টানের জন্য তরলের উপরিতল সবসময় সঙ্কুচিত হতে চায়। এখানে প্রথম পরীক্ষায় খ অংশের পর্দা সঙ্কুচিত হবার জন্য সুতোটা ভেতর দিকে ঢুকে টান হয়ে যায়।

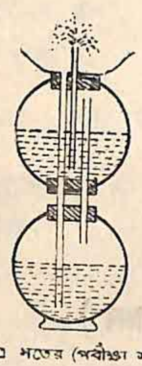
দ্বিতীয় পরীক্ষায় ফাঁসের বাইরের পর্দা সঙ্কুচিত হবার জন্য ফাঁসের ভিতরের আয়তন বৃদ্ধি পায়। একই পরিসীমা বিশিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সব চেয়ে বেশী। সেই জন্য ফাঁসটা গোল হয়ে যায়।

তৃতীয় পরীক্ষায় পর্দার আয়তন কমে যাওয়ার জন্য তারটা সরে যায়।

১৭। হিরোর স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা

প্রয়োজন ঃ দুটি কাচ বা অন্য কিছুর গ্লোব (একটি গ্লোবের নীচে মাটিতে বসানোর ব্যবস্থা থাকবে আর উপরে থাকবে বড় ছিদ্র, অন্য গ্লোবের নীচে এবং উপরে দুদিকেই থাকবে বড় ছিদ্র)। গ্লোবের ছিদ্র বা মুখের তিনটি কর্ক, একটি ছিদ্রওয়ালা বড় প্লেট আর তিনটি কাচের নল।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে নীচের গ্লোবে অর্ধেক জল ভর্তি কর। একটা কর্কে দুটো নল ঢুকিয়ে কর্কটাকে নীচের গ্লোবের মুখে বসিয়ে দাও। আর একটা কর্কে দুটো ছিদ্র করে উপরের গ্লোবের নীচের মুখে বসাও। এবার নীচের গ্লোবের নল দুটো উপরের গ্লোবের নীচের কর্কের ছিদ্র দিয়ে উপরের গ্লোবের ভিতরে ঢুকিয়ে দাও। উপরের গ্লোবে অর্ধেক জল ভর্তি কর। তৃতীয় কর্কে দুটো ছিদ্র করে তা দিয়ে উপরের গ্লোব আর প্লেট জুড়ে দাও। দ্বিতীয় গ্লোবের মাঝখানের নলটা প্লেটের উপরে কিছুটা বেরিয়ে থাকবে, এই নলের উপরের মুখটা ড্রপারের মুখের মত সূচালো হলে ভাল হয়। নীচের গ্লোবের একটা নল প্লেট পর্যন্ত আসবে। প্রতিটি ছিদ্র যেন বায়ুনিরুদ্ধভাবে বন্ধ থাকে। এবার প্লেটে কিছু জল ঢাললেই স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারার কাজ সুরু হয় এবং প্লেটের মাঝখানের নলের সরু মুখ দিয়ে ফোয়ারার আকারে চারিদিকে অবিরাম জল ছড়িয়ে পড়ে। যতক্ষণ উপরের গ্লোবে জল থাকে ততক্ষণ এই ফোয়ারা চালু থাকে। দুহাজার বছরেরও আগে হিরো নামে একজন গণিতবিদ্ এই সুন্দর ফোয়ারা আবিষ্কার করেন (চিত্র ১৭)।



চিত্র সতের (পরীক্ষা সতের)

ব্যাখ্যা ঃ প্লেটে জল ঢাললে সেই জল নীচের গ্লোবে এসে পড়ে আর নীচের গ্লোবের জলের আয়তন বৃদ্ধি পায়। ফলে নীচের গ্লোবের ভিতরের বাতাসের আয়তন সঙ্কুচিত হয় আর তার চাপ বৃদ্ধি পায়। এতে নীচের গ্লোব থেকে কিছু বাতাস উপরের গ্লোবে চলে যায়। ফলে উপরের গ্লোবের বাতাসের চাপ বেড়ে যায় এবং মাঝখানের নল দিয়ে উপরের গ্লোবের জল উপরে উঠে এসে ফোয়ারার সৃষ্টি করে। এই ফোয়ারার জল প্লেটে পড়ে। সেই জলটা আবার

নীচের গ্লোবে চলে যায়। ফলে ফোয়ারার ক্রিয়া অবিরাম চালু থাকে এবং উপরের গ্লোবের সব জলই শেষ পর্যন্ত ফোয়ারার আকারে বাইরে বেরিয়ে আসে।

১৮। মজার ঘোড়া!

প্রয়োজন ঃ একটা প্লাস্টিক বা অন্য যে কোন জিনিষের হাল্কা ঘোড়া, একটা লোহার ভারী বল আর একটা তার।

পদ্ধতি ঃ তার দিকে ঘোড়ার বুকের সঙ্গে লোহার বলটা বেঁধে দাও। ঘোড়ার ওজনের অনুপাতে বল ভারী হওয়া চাই। তার ছবির মত বাঁকানো হবে। এবার ঘোড়াটাকে পিছনের পায়ের উপর টেবিলের ধারে বসিয়ে দিলে সেটা পিছনের পায়ে ভর করে শূন্যেই দাঁড়িয়ে থাকবে (চিত্র ১৮)।



১৪ নং চিত্র (পরীক্ষা নং ১৪)

ব্যাখ্যা ঃ ভারী বলের জন্য সব জিনিষটার ভারকেন্দ্র গিয়ে পড়েছে পিছনের পায়ের ঠিক নীচে। এই জন্যই ঘোড়াটা শুধু পিছনের পায়ে ভর করে শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ('পেন্সিলের নাচ' পরীক্ষা চার দেখ।)

১৯। ব্যালান্সের খেলা!

প্রয়োজন ঃ একটা বোতল, দুটো কর্ক, একটা সূচ বা পিন, একটা আধুলি এবং দুটো কাঁটা চামচ।



চিত্র ১৭ (পরীক্ষা ১৭)

পদ্ধতি ঃ বোতলের মুখে আঁটা কর্কের মধ্যে একটা সূচ বা পিন বসানো আছে। সূচ বা পিনের সূচালো দিকটা বোতলের বাইরে বেরিয়ে থাকবে। এবার সবাইকে জিজ্ঞাসা কর তাদের মধ্যে কেউ একটা আধুলিকে পিনের ডগায় খাড়াভাবে বসিয়ে রাখতে পারবে কিনা।

কৌশল ঃ একটা ছুরি দিয়ে দ্বিতীয় কর্কের তলার দিক চিরে ফেলে সেখানে আধুলির অর্ধেক ঢুকিয়ে দাও। কাঁটা চামচ দুটো এই কর্কের গায়ে

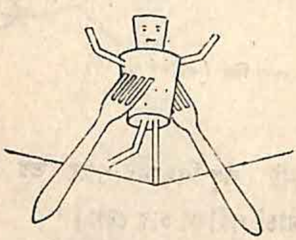
দুপাশে হেলানোভাবে বিঁধিয়ে দাও। এখন আধুলিটাকে সবসুদ্ধ পিনের ডগায় বসিয়ে দিলে দেখা যাবে সেটা সব নিয়ে পিনের আগায় খাড়াভাবে বসে থাকছে। এমনকি একটু দুলিয়ে দিলেও কয়েকবার দোল খেয়ে আবার স্থির হয়ে বসে থাকবে, পড়ে যাবে না (চিত্র ১৯)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে কাঁটা চামচ দুটো থাকার জন্য সবসুদ্ধ আধুলিটার ভারকেন্দ্র থাকছে পিনের ডগার ঠিক নীচে। সেই হেতু আধুলিটা পড়ে যাচ্ছে না। ('পেন্সিলের নাচ' পরীক্ষা চার দেখ।)

২০। তারের উপর ব্যালান্স !

প্রয়োজন ঃ একটি লম্বা তার, একটা কর্ক, দুটো কাঁটা চামচ এবং কয়েকটা দেশলাই কাঠি।

পদ্ধতি ঃ কর্কটার গায়ে দুপাশে দুটো দেশলাই কাঠি আটকে দাও, এ দুটো হবে হাত। নীচে একটা কাঠি সোজাভাবে আর একটা কাঠি বাঁকা ভাবে ঢুকিয়ে দাও, এ দুটো হল পা। সোজা পা-টার নীচে একটু খাঁজ কেটে নাও যাতে এই পায়ে ভর করে তারের উপর দাঁড়ানো সহজ হয়। কর্কের গায়ে রঙ দিয়ে চোখমুখ এঁকে নাও যাতে মানুষের মত দেখতে হয়। এবার কর্কের গায়ে বিপরীত দিকে দুটো কাঁটা-চামচ লাগিয়ে দাও। সব মিলে যেন একজন খেলোয়াড় তৈরি হল।



চিত্র কুড়ি (পরীক্ষা কুড়ি)

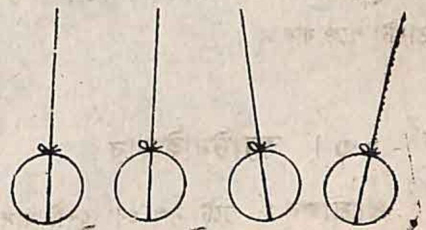
এখন ঘরের মধ্যে লম্বা তারটা খাটিয়ে সেটার উপর খেলোয়াড়ের খাঁজকাটা পা-টা বসিয়ে দাও। দেখবে খেলোয়াড় ঠিক তারের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তারটাকে একটু নাড়াচাড়া করলে খেলোয়াড় তারের উপর এদিকে সেদিকে চলতে থাকবে (চিত্র ২০)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানেও আগের 'ব্যালান্সের খেলার' মত একই কারণে খেলোয়াড় তারের উপর দাঁড়িয়ে থাকছে।

২১। বল কেন কাছে আসছে ?

প্রয়োজন ঃ দুটো হাল্কা বল এবং সুতো।

পদ্ধতি ঃ বল দুটোকে সুতো দিয়ে পরস্পর থেকে পাঁচ-ছয় সেন্টিমিটার দূরে একই উচ্চতায় ঝুলিয়ে রাখ। এখন বল দুটোর মাঝখান দিয়ে জোরে ফুঁ দিলে কি হবে ? তুমি নিশ্চয়ই মনে করবে বল দুটো পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাবে। কিন্তু না, বল দুটো পরস্পরের আরও কাছাকাছি চলে আসবে।



চিত্র একুশ (পরীক্ষা একুশ)

ব্যাখ্যা : অষ্টাদশ শতাব্দীর সুইস বিজ্ঞানী বার্নোলির সূত্রানুযায়ী কোন তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের গতিবেগ যত বৃদ্ধি পায়, তার চাপ তত কমে যায়। সুতরাং জোরে ফুঁ দিলে বল দুটোর মাঝখানের বাতাসের গতি বেড়ে যায়, ফলে চাপ কমে যায়। কিন্তু বাইরের বাতাসের চাপ একই থাকে। ফলে বাইরের বাতাসের চাপ মাঝখানের বাতাসের চাপের চেয়ে বেশী হয়। তখন বাইরের বাতাসের চাপে বল দুটো পরস্পরের কাছে চলে আসে। (চিত্র ২১)।

২২। তাস কেন পড়ে যায় না ?

প্রয়োজন ঃ একটা তাস বা পোস্টকার্ড ও একটা সুতোর কাটিম।

পদ্ধতি ঃ তাস না পেলে পোস্টকার্ড থেকে তাসের আকারের একটা অংশ কেটে নাও। কাটিমটাকে ডান হাতে ধরে তাসটাকে বাঁ হাতে কাটিমের নীচে ধর। এবার কাটিমের উপরের ছিদ্রে যত জোরে পার নীচের দিকে ফুঁ দাও। ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের তাস ছেড়ে দাও।



২২ নং চিত্র (পরীক্ষা ২২ নং)

কি মনে হবে ? ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাসখানা নীচে পড়ে যাবে ? তা কিন্তু হবে না। যতক্ষণ ফুঁ দিতে

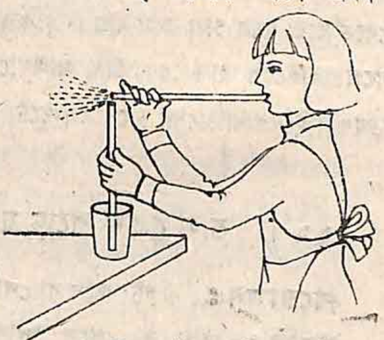
থাকবে, ততক্ষণ তাসটা নীচে না পড়ে কাটিমের সঙ্গে লেগে থাকতে চাইবে (চিত্র ২২)।

ব্যাখ্যা ঃ 'বল কেন কাছে আসছে' পরীক্ষার মতই এখানে ফুঁ দিলে তাসের উপরের বাতাসের গতিবেগ বাড়ে, ফলে চাপ কমে। কাজেই তাসের নীচের বাতাসের চাপ উপরের বাতাসের চাপের চেয়ে বেশী হয়। এই জন্যই তাসটা পড়ে যায় না।

২৩। অ্যাটমাইজার

প্রয়োজন ঃ দুটো নল এবং একটি গ্লাস।

পদ্ধতি ঃ এক গ্লাস জল নাও, একটি নল জলের মধ্যে সোজাভাবে ডুবিয়ে বাঁ হাতে ধরে রাখ। অন্য নলের মুখটি খাঁড়া নলের মুখের উপর রেখে ডান হাতে ধরে থাক। দুটো নলের মাঝের কোণ হবে এক সমকোণ। এখন দ্বিতীয় নলের অন্য মুখে জোরে ফুঁ দাও। কি দেখবে? ফুঁ দেবার আগে প্রথম নলের ভেতরের জলের তল আর গ্লাসের জলের তল সমান ছিল। ফুঁ দিলে প্রথম নলের জলের তল গ্লাসের জলের তলের চেয়ে উপরে উঠে আসে। আরও জোরে ফুঁ দিলে প্রথম নলের জলের তল আরও উঠে যায় এবং শেষ পর্যন্ত জল স্প্রের আকারে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে (চিত্র ২৩)।



চিত্র তেইশ (পরীক্ষা তেইশ)

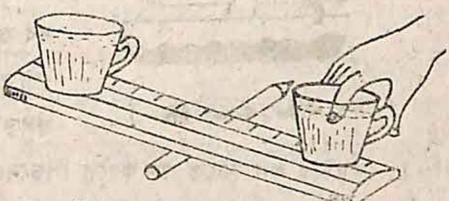
ব্যাখ্যা ঃ 'বল কেন কাছে আসছে' পরীক্ষার মত এখানেও ফুঁ দিলে জলের উপরে প্রথম নলের ভিতরের বাতাসের চাপ কমে যায়। ফলে বাইরের বাতাসের চাপে জল প্রথম নলের মধ্যে উপরে উঠে যায় এবং অবশেষে বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

তোমরা নিশ্চয়ই অ্যাটমাইজার বা স্প্রেয়ার দেখেছ যার সাহায্যে সেণ্ট ইত্যাদি স্প্রে করা হয়। এটাও সেই একই রীতিতে কাজ করে।

২৪। গ্লাসের ওজন বাড়ল কেন?

প্রয়োজন ঃ একটা চ্যাপ্টা স্কেল বা কাঠ, একটা পেন্সিল বা সরু কাঠ, দুটো আইসক্রীম কাপ বা ছোট বাটি এবং জল।

পদ্ধতি ঃ টেবিলের উপরে পেন্সিল বা সরু কাঠ রাখ। পেন্সিলের উপরে স্কেল রেখে তার দুই প্রান্তে দুটো জলভর্তি আইসক্রীম কাপ বসাও। কাপ দুটো এমনভাবে ব্যালান্স করে বসাও যাতে স্কেলটা আনুভূমিক (মাটির সঙ্গে সমান্তরাল) ভাবে থাকে। এবার বাঁ দিকের কাপের জল বা হাতের তর্জনী কিছুটা ডুবিয়ে দাও; আঙুল কিন্তু কাপের কোথায়ও স্পর্শ করবে না, সঙ্গে সঙ্গে কাপটা নীচে নেমে যাবে অর্থাৎ স্কেল আর আনুভূমিক থাকবে না। এরপর ডান হাতের তর্জনী ডান কাপের জলে বাঁ হাতের তর্জনীর সমান পরিমাণ ডুবিয়ে দাও। দেখবে স্কেল আবার আনুভূমিক হয়ে গেছে। এইভাবে কাপের কোন জায়গায় স্পর্শ না করে শুধু আঙুল ডুবিয়েই তুমি স্কেলকে নিজের ইচ্ছামত ওঠানামা করাতে পারবে (চিত্র ২৪)। এই পরীক্ষায় প্রমাণ হয় যে, আঙুল ডুবিয়ে দিলে গ্লাসের ওজন বেড়ে যায়।


চিত্র চব্বিশ (পরীক্ষা চব্বিশ)

ব্যাখ্যা ঃ জলে তর্জনী ডোবালে তর্জনী কিছু জল অপসারণ করে, ফলে কাপে জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কাপের তলদেশে জলের মোট চাপও বৃদ্ধি পায় (কারণ তরলের চাপ নির্ভর করে গভীরতার উপর) এবং কাপটি নীচের দিকে নেমে যায়। অন্য কাপেও আঙ্গুল ডোবালে দুটো কাপেই সমান বল প্রযুক্ত হয়, ফলে স্কেল আবার আনুভূমিক হয়ে যায়।

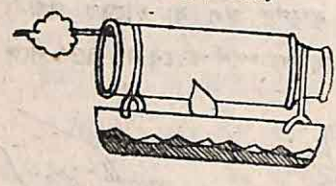
তর্জনী যতটা জল অপসারণ করে (অর্থাৎ তর্জনীর যত অংশ জলের নীচে ডোবানো আছে তার সমায়তন) সেই জলের ওজন যত কাপের, ওজনও ঠিক তত বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ এই পরিমাণ ওজন অন্যদিকে চাপালে স্কেল আবার আনুভূমিক হবে (ওজন কি কমে যাবে প্রশ্ন নয়—এর উত্তর দেখ)।

২৫। বাষ্পীয় পোত।

প্রয়োজন : একটা হাল্কা চৌকো পাত্র। একটা ছোট চোঙাকৃতি কৌটো, একটা মোমবাতি ও কিছু তার।

পদ্ধতি : কৌটোর তলার দিকে এক পাশে একটা ছিদ্র কর। কৌটোর মধ্যে গরম জল ভর্তি করে মুখ বন্ধ করে দাও। এবার কৌটোটা চৌকো পাত্রের সঙ্গে তার দিয়ে বেঁধে ফেল। কৌটোর ছিদ্রটা উপরের দিকে থাকবে। একটা মোমবাতি পাত্রের উপর কৌটোর নীচে বসিয়ে বাতিটা জ্বেলে দাও। সব সুদ্ধ পাত্রটা যেন একটা বাষ্পীয় পোত। এই বাষ্পীয় পোতকে একটা জলভর্তি বড় পাত্রের জলে ভাসিয়ে দাও। কৌটোর জল ফুটতে শুরু করলে পিছনের ছিদ্র দিয়ে বাষ্প বেরিয়ে যাবে, আর বাষ্পীয় পোতও সামনের দিকে চলতে থাকবে (চিত্র ২৫)।

চিত্র 59 (পরীক্ষা 69)



চিত্র পঁচিশ (পরীক্ষা পঁচিশ)

ব্যাখ্যা : বাষ্প কৌটোর গায়ে সব দিকেই চাপ দেয় ; কৌটোর ডানদিকের এবং বাঁ-দিকের গায়ের উপর চাপ সমান এবং বিপরীত বলে কাটাকুটি হয়ে যায় কিন্তু কৌটোর সামনের এবং পেছনের গায়ের উপর চাপ সমান নয়, কারণ পিছনের গায়ে একটি ছিদ্র আছে ; এই ছিদ্রের অংশে পিছনের গায়ে কোন চাপ প্রযুক্ত হচ্ছে না। সুতরাং কৌটোর সামনের গায়ের উপর চাপ পিছনের গায়ের উপর চাপের থেকে কিছু বেশী। ফলে কৌটো অর্থাৎ বাষ্পীয় পোত সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

২৬। বিনা তাপে জল ফোটানো।

প্রয়োজন : একটা কাচের গ্লাস ও একটি রুমাল।

পদ্ধতি : কাচের গ্লাসের কিছুটা জলে ভর্তি করে সকলকে বল—কেউ তাপ প্রয়োগ না করে এই জলটা ফোটাতে পারে কিনা ?

কৌশল : একটা ভিজা রুমাল দিয়ে গ্লাসের মুখটা ঢেকে দাও। রুমালের মাঝখানটা আঙুল দিয়ে চেপে একটা বাটির মত গর্ত কর ; রুমালের মধ্যস্থল যেন

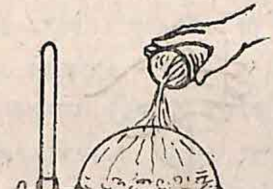
গ্লাসের জলের সঙ্গে লেগে থাকে। রুমালশুদ্ধ গ্লাসটা উল্টে দিয়ে বা হাতে ধরে থাক। উল্টে দেবার পরেও রুমালটা বাতাসের চাপে উল্টানো বাটির মত উপর দিকে ফুলে থাকবে। এবার গ্লাসের পিছনে ডান হাত দিয়ে চাপ দাও আর সেই সঙ্গে রুমালটা গ্লাসের মুখে টান করে ধর—যাতে গ্লাসের মুখে রুমালের অংশটা মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসের জলের মধ্যে ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্ উঠতে দেখা যাবে অর্থাৎ মনে হবে যেন জলটা ফুটছে (চিত্র ২৬)।



চিত্র নং ২৬ (পরীক্ষা নং ২৬)

ব্যাখ্যা ঃ রুমালটা টান করে ধরলে রুমালের উপর গ্লাসের সেই অংশ তার আয়তনে বেড়ে যায়; ফলে গ্লাসের ভিতরের বাতাস প্রসারিত হয়, আর তার চাপ কমে যায়। তখন বাইরের বাতাসের চাপ বেশী থাকার জন্য, বাইরে থেকে কিছু বাতাস রুমালের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে গ্লাসের ভিতরে প্রবেশ করে। এই বাতাস গ্লাসের জলের ভিতর দিয়ে যখন উপরে ওঠে, তখন জলের মধ্যে বুদবুদের সৃষ্টি হয় ফলে মনে হয় জলটা যেন ফুটছে।

২৭। ঠাণ্ডা দিয়ে কি জল ফোটান যায়?


27 নং চিত্র (পরীক্ষা নং 27)

প্রয়োজন ঃ একটি গোলতল ফ্লাস্ক, এর মুখের ছিপি, একটি স্ট্যাণ্ড ও তার রিং, গরম করার ব্যবস্থা।

পদ্ধতি ঃ সবাইকে প্রশ্ন কর ঠাণ্ডা প্রয়োগ করে কি জল ফোটান সম্ভব?

কৌশল ঃ ফ্লাস্কটি অর্ধেক জলপূর্ণ কর। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফ্লাস্কের জল ফোটাও—যাতে উৎপন্ন জলীয় বাষ্প ভিতরের সব বাতাস বার করে দেয়। তাপ দেওয়া বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাস্কের মুখ বায়ুনিরুদ্ধ ভাবে ছিপি দিয়ে বন্ধ কর। ফ্লাস্কটিকে এবার

স্ট্যাণ্ডের রিং-এর উপর উল্টানো ভাবে বসাও। ফ্লাস্কের ভিতরে জল ফোটা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। জল ফোটা অর্থাৎ জলের মধ্যে বুদ্‌বুদ্‌ সৃষ্টি হওয়া বন্ধ হলে, ফ্লাস্কের উপরে ঠাণ্ডা জল ঢাল। সবাই অবাক হয়ে দেখবে ফ্লাস্কের জল আবার ফুটতে শুরু করেছে (চিত্র ২৭)।

ব্যাখ্যা ঃ কোন তরলের স্ফুটনাঙ্ক নির্ভর করে, তার উপর প্রযুক্ত চাপের উপর। চাপ বাড়লে স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে, আর চাপ কমে গেলে স্ফুটনাঙ্কও কমে যায়।

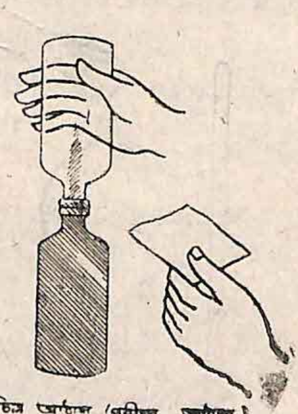
এখানে উল্টানো ফ্লাস্কে ছিল কিছু জল আর জলীয় বাষ্প। ফ্লাস্কের উপর ঠাণ্ডা জল ঢাললে ফ্লাস্কের ভিতরের কিছু জলীয় বাষ্প জমে গিয়ে জলকণায় পরিণত হয়; ফলে ফ্লাস্কের জলের উপর চাপ কমে যায়, তাতে জলের স্ফুটনাঙ্কও কমে যায়। কাজেই ফ্লাস্কের জলের উষ্ণতা ১০০° সেলসিয়াসের চেয়ে কম থাকা সত্বেও এই জল আবার ফুটতে আরম্ভ করে। এই পরীক্ষাকে বলা হয় ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষা।

গোলতল ফ্লাস্কটা মোটা আর শক্ত কাচের হওয়া চাই না হলে বাইরের বাতাসের চাপে তা ফেটে যেতে পারে।

২৮। নীচের জল কি উপরে উঠতে পারে ?

প্রয়োজন ঃ দুটো বোতল, ঠাণ্ডা এবং গরম জল, একটা মোটা কাগজ এবং কালি বা জলের রং।

পদ্ধতি ঃ সবাইকে দুটো খালি বোতল দেখিয়ে জিজ্ঞেস কর, এই বোতল দুটো জল-ভর্তি করে একটা বোতলের উপর আর একটা বোতল রাখলে, নীচের বোতলের জল কি উপরের বোতলে যেতে পারবে ?



চিত্র [illegible] ([illegible] [illegible])

প্রস্তুতি ঃ গরম জলে রং মিশিয়ে একটা বোতল (যেটা নীচে থাকবে) এই রঙিন জলে ভর্তি কর। নীচের বোতলের জল যে উপরে উঠছে, তা বোঝার জন্য নীচের বোতলে রঙিন জল রাখছ। অন্য বোতল ঠাণ্ডা জলে ভর্তি কর। রঙিন জলটা যে গরম, তা যেন কেউ বুঝতে না পারে। এবার দ্বিতীয় বোতলের

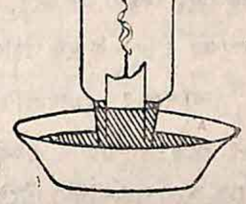
মুখে একটা কাগজ রেখে দ্বিতীয় বোতল প্রথমের উপর উল্টে করে বসাও। দুটো বোতল ঠিক মুখে মুখে বসিয়ে মোটা কাগজ সরিয়ে দাও। ফলে দুটো বোতলের জল পরস্পরের সংস্পর্শে আসবে এবং সকলে দেখবে নীচের বোতলের রঙিন জল আস্তে আস্তে উপরে উঠছে, আর উপরের বোতলের বর্ণহীন জল নীচে নামছে (চিত্র ২৮)।

ব্যাখ্যা ঃ তোমরা জান যে, সাধারণ নিয়ম হল,—কোন জিনিস গরম করলে তা হাল্কা হয়। সুতরাং ঠাণ্ডা জলের চেয়ে গরম জল হাল্কা, আর নীচের বোতলের জল হাল্কা বলে উপরে উঠে যায়। গরম জলে কিন্তু বেশী রং মেশাবে না, কারণ বেশী রং দিলে জল ভারী হয়ে পড়ে।

২৯। বোতলে জল উঠল কেন?

প্রয়োজন ঃ একটি গামলা বা বড় বাটি, একটা বড় বোতল বা কাচের গ্লাস, একটি ছোট বাটি ও কিছু গন্ধক চূর্ণ।

পদ্ধতি ঃ গামলায় জল ঢাল। ছোট বাটিতে একটু গন্ধকচূর্ণ রেখে বাটিটা গামলার জলে ভাসিয়ে দাও। গন্ধকে আগুন ধরিয়ে বোতল উপুড় করে বাটিটা ঢেকে দাও। কিছুক্ষণ পরে গন্ধকের আগুন নিভে যাবে।



চিত্র ঊনত্রিশ (পরীক্ষা ঊনত্রিশ)

এই সঙ্গে আরেকটা জিনিস ঘটে। প্রথমে বোতলের ভিতরে আর বাইরে জলের তল সমান ছিল, কিন্তু পরে দেখা যাবে বোতলের ভিতরের জলের তল বাইরের জলের তলের চেয়ে অনেকটা উপরে উঠে গেছে। (চিত্র ২৯)।

ব্যাখ্যা ঃ গন্ধক জলার ফলে বোতলের ভিতরের অক্সিজেন ক্রমশঃ ফুরিয়ে যায়, আর যখন সব অক্সিজেন ফুরিয়ে যায়, তখনই গন্ধক নিভে যায়। আর গন্ধকের দহনের ফলে উৎপন্ন হয় সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস। এই গ্যাস জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়।

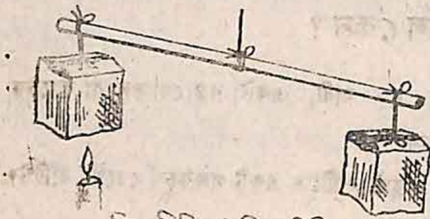
এই সালফার ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হওয়ার ফলে বোতলের ভিতরে বাতাসের চাপ কমে যায় এবং বাইরের বাতাসের চাপে জল বোতলের ভিতর প্রবেশ করে। আর বোতলের ভিতরের জলের তল উপরে উঠে যায়। বাতাসে

অক্সিজেনের পরিমাণ আয়তন হিসাবে মোটামুটি পাঁচ ভাগের একভাগ। সেইজন্য গামলায় আরও জল ঢেলে বোতলের ভিতরে আর বাইরে জলের তল সমান করলে দেখা যাবে--বোতলের ভিতরে মোটামুটি পাঁচ ভাগের এক ভাগ জল প্রবেশ করেছে।

৩০। না ছুঁয়ে কিভাবে উপরে তুলবে ?

প্রয়োজন ঃ দুটো একমুখ খোলা সমান আকারের কাগজের বাক্স, একটা লাঠি, মোমবাতি এবং সুতো।

পদ্ধতি ঃ লাঠির দুই প্রান্তে কাগজের বাক্স দুটো সুতো দিয়ে বাঁধ, বাক্সের খোলা মুখ যেন নীচের দিকে থাকে। লাঠির মাঝখানে সুতো বেঁধে এমনভাবে ঝুলিয়ে দাও যেন লাঠিটা অনুভূমিক অর্থাৎ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে থাকে। এবার তোমার বন্ধুদের বল তাদের মধ্যে কেউ জিনিসটাকে হাত দিয়ে বা অন্য কোন কিছু দিয়ে স্পর্শ না করে, বা জিনিসটার মধ্যে কোন কিছু না ফেলে, একটা কাগজের বাক্সকে উপরে ওঠাতে পারে কিনা ?



চিত্র তিরিশ (পরীক্ষা তিরিশ)

কৌশল ঃ মোমবাতি জেলে যে-কোন একটা বাক্সের নীচে ধর ; সাবধান যেন পুড়ে না যায়। একটু পরে দেখবে—এই বাক্সটা আস্তে আস্তে উপরে উঠে যাচ্ছে আর অন্য বাক্সটা নীচে নেমে যাচ্ছে (চিত্র ৩০)।

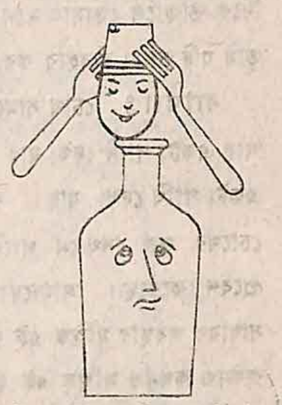
ব্যাখ্যা ঃ মোম জ্বাললে তার উপরের বাতাস গরম হয়। বাতাস গরম হলেই (আয়তনে প্রসারিত হয়ে) হাল্কা হয়, আর হাল্কা বাতাস উপরে উঠতে চায়। ফলে সেই দিকের বাক্স উপরে উঠে যায়।

৩১। খেলোয়াড় ডিম।

প্রয়োজন ঃ একটি ডিম, একটি বোতল, একটি কর্ক এবং দুটো কাঁটা-চামচ।

পদ্ধতি ঃ কর্কের মোটা দিকের ভিতরের অংশ ছুরি দিয়ে চেঁছে বাদ দাও— যাতে কর্কটা একটা টুপির মত হয়। কর্কটা ডিমের সরু দিকের মাথায় বসিয়ে

দাও ; কাঁটা চামচ দুটো কর্কের দুপাশে ফুটিয়ে দাও। ডিমের গায়ে চোখ মুখ ইত্যাদি তুলি দিয়ে এঁকে মানুষের মত কর। এখন এটা হল খেলোয়াড় ডিম। খেলোয়াড় ডিমকে বোতলের মুখের কিনারে বসিয়ে দাও। খেলোয়াড় ডিম সার্কাসের খেলোয়াড়ের মত বোতলের মুখে বসে থাকবে। একটু নাড়িয়ে দিলে খেলোয়াড় ডিমের নাচও দেখতে পাবে (চিত্র ৩১)।



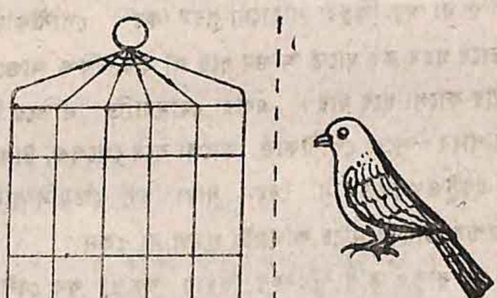
চিত্র একত্রিশ (পরীক্ষা একত্রিশ)

ব্যাখ্যা ঃ কাঁটা চামচ দুটো থাকার জন্য খেলোয়াড় ডিমের ভারকেন্দ্র অনেক নীচে নেমে যায় ; আর ভারকেন্দ্র এবং ডিম ও বোতলের স্পর্শবিন্দু একই উলম্ব রেখায় থাকে, ফলে খেলোয়াড় ডিম পড়ে যায় না, পেন্সিলের নাচ—পরীক্ষা চার দেখ।

৩২। পাখি খাঁচার ভিতর এল কি করে ?

প্রয়োজন ঃ সাদা কাগজ।

পদ্ধতি ঃ সাদা কাগজের একদিকে একটা খাঁচা আর অন্যদিকে একটা পাখি আঁক। দুটোর মাঝখানে দুই তিন সেন্টিমিটার দূরত্ব রাখ। খাঁচাটা এত



চিত্র বত্রিশ (পরীক্ষা বত্রিশ)

বড় হবে যাতে তার মধ্যে পাখিটা অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। খাঁচা আর পাখীর মাঝখানে একটা সরল রেখা আঁক। একটা মোটা কাগজ, যেমন একটা

বইয়ের মলাট, এই সরল রেখার উপর খাড়াভাবে রাখ। তোমার মুখটা কাগজের কাছে নিয়ে এস—যাতে তোমার নাক এই মোটা কাগজ স্পর্শ করে। এখন ছবির দিকে তাকালে তোমার মনে হবে পাখিটা যেন খাচার ভিতর ঢুকে পড়েছে। তুমি যদি চশমা ব্যবহার কর,তাহলে চশমা খুলে ছবির দিকে তাকাও (চিত্র ৩২)।

ব্যাখ্যা ঃ চোখ সামনে আনলে বাঁ-চোখের জন্য ডানদিকে একটা খাঁচা আর একটা পাখি দেখা যায় ; আবার ডান চোখের জন্য বাঁ-দিকে একটা খাঁচা আর একটা পাখি দেখা যায়। সুতরাং বাঁ-চোখের জন্য যেখানে খাঁচা দেখা যায় ডান চোখের জন্য সেখানে পাখি দেখা যায়। ফলে মনে হয় পাখিটা খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করেছে। আমাদের দু'চোখে যে-কোন বস্তুর দুটো ছবি দেখতে পাই। সাধারণ অবস্থায় মস্তিষ্ক এই দুটো ছবি মিলিয়ে একটা ছবি তৈরি করে। কিন্তু কখনও কখনও মস্তিষ্ক এই দুটো ছবি একসঙ্গে মেলাতে পারে না। তখনই এই ধরণের দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি হয়।

৩৩। টাকার নীচের কাগজ পুড়ল না কেন ?

প্রয়োজন ঃ একটি মোটা কাগজ বা পোস্টকার্ড এবং একটি এক টাকার মুদ্রা।

পদ্ধতি ঃ পোস্টকার্ডের উপর টাকাটা রাখ। টাকাসমেত পোস্টকার্ড জ্বলন্ত মোমবাতি বা অন্য কিছুর সাহায্যে গরম কর। পোস্টকার্ড এদিক-ওদিক সরিয়ে এমনভাবে গরম কর যাতে আগুন ধরে না যায়, কিন্তু আগুনের তাপে সমস্ত পোস্টকার্ড প্রায় কালো হয়ে যায়। এবার মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে টাকা তুলে নিলে দেখতে পাবে—পুরো পোস্টকার্ড কালো হয়ে গেলেও, টাকা যেখানে ছিল সে জায়গাটা একটুও পোড়ে নি, যেমন সাদা ছিল তেমনি সাদাই রয়ে গেছে। সবাই তো আশ্চর্য, টাকার নীচে কাগজটা পুড়ল না কেন ?

ব্যাখ্যা ঃ ধাতুর তাপ পরিবহণ করার ক্ষমতা খুব বেশী ; সেইজন্য ধাতু নির্মিত টাকার ভিতর দিয়ে তাপ খুব দ্রুত সঞ্চালিত হয়ে যায়। ফলে টাকার নীচের কাগজের উষ্ণতা খুব বেশী বৃদ্ধি পায় না। আর কাগজের উষ্ণতা কাগজের জ্বলনাঙ্কের চেয়ে কম থাকার জন্য কাগজ পুড়ে যায় না।

৩৪। কুয়াশা এল কোথা থেকে ?

প্রয়োজন ঃ একটা বড় বোতল ও তার ছিপি, কাচের নল, রাবারের নল ও একটি সাইকেল পাম্প।

পদ্ধতি ঃ ছিপিতে ছিদ্র করে তার মধ্যে কাচের নলটি পরিয়ে দাও। কাচের নলের সঙ্গে রাবারের নল আটকে দাও। বোতলে অল্প একটু জল দিয়ে বোতলের মুখ ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দাও। এখন সাইকেল পাম্প, রাবারের নলের সঙ্গে যুক্ত করে, বোতলের মধ্যে পাম্প করে, বেশ কিছুটা বাতাস ঢোকাও। কিছুক্ষণ পরে বোতলের মুখ থেকে ছিপিটা একটানে খুলে নিলেই বোতলের ভিতরে কুয়াশা উৎপন্ন হবে। আগে থেকেই বোতলের ভিতর যদি একটু ধোঁয়া থাকে, তাহলে গাঢ় কুয়াশা সৃষ্টি হবে (চিত্র ৩৩)।



চিত্র তেত্রিশ (পরীক্ষা চৌত্রিশ)

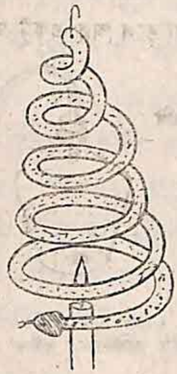
ব্যাখ্যা ঃ বোতলের ভিতরে পাম্প করে অনেকটা বাতাস ঢোকানো হয়েছে। বোতলের মধ্যে জল থাকার জন্য এই বাতাস কিছুক্ষণের মধ্যে জলীয় বাষ্পে সংপৃক্ত হয়ে পড়ে। ছিপি খুলে দিলে এই বাতাসের আয়তন হঠাৎ অনেকটা বৃদ্ধি পায় ফলে তার উষ্ণতা কমে যায়। উষ্ণতা কমে গেলে এই বাতাসের কিছু জলীয় বাষ্প জমে গিয়ে সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এটাই হল কুয়াশা। ধোঁয়া বা ধুলার উপর জলকণা জমলে কুয়াশা খুব গাঢ় হয়।

৩৫। সাপ কেন ঘুরছে ?

প্রয়োজন ঃ একটা মোটা কাগজ আর একটা মোমবাতি।

পদ্ধতি ঃ মোটা কাগজ থেকে আট নয় সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত কেটে বার কর। বৃত্তের উপর ৩৪ নম্বর চিত্রের মত একটা বক্ররেখা আঁক। বৃত্তটাকে কাঁচি দিয়ে বক্ররেখা বরাবর ভিতরের দিকে প্যাঁচানোভাবে কেটে নাও। এভাবে একটা কুণ্ডলী পেলে কুণ্ডলীর উপর সাপের গায়ের মত দাগ এঁকে নাও। তাহলে একটা কাগজের সাপ তৈরি হল। সাপের লেজে

একটা পিন ফুটিয়ে পিনটা সুতো দিয়ে উপর থেকে ঝুলিয়ে দাও। এর ফলে সাপের মুখটা একটু নীচের দিকে ঝুলে পড়বে। এবার সবাইকে জিজ্ঞেস কর— কেউ সাপ বা সুতোকে কোনোভাবে স্পর্শ না করে সাপটাকে ক্রমাগত ঘোরাতে পারে কিনা?



চিত্র নং ৩৫ (পরীক্ষা নং ৩৫)



চিত্র নং ৩৪ (পরীক্ষা নং ৩৫)

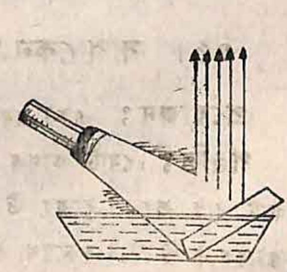
কৌশল ঃ সাপের কুণ্ডলীর কেন্দ্র-বরাবর কিছু নিচে একটা মোমবাতি বা টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দিলেই সাপটা ক্রমাগতঃ ঘুরতে আরম্ভ করবে (চিত্র ৩৫)।

ব্যাখ্যা ঃ মোম জ্বালাবার ফলে বাতাসে একটা পরিচলন স্রোত সৃষ্টি হয় অর্থাৎ মোমের উপরের বাতাস গরম হবার ফলে হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় আর চারদিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস সেখানে ছুটে আসে। এই বায়ুপ্রবাহের ধাক্কাতেই সাপের কুণ্ডলীটা ঘুরতে থাকে।

৩৬। ঘরের ভিতর বর্ণালি!

প্রয়োজন ঃ এক পাত্র জল, একটি আয়না এবং একটি টর্চ।

পদ্ধতি ঃ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ কর। আয়না পাত্রের জলের মধ্যে হেলানোভাবে ডুবিয়ে রাখ। এবার টর্চ জেলে আয়নার জলে ডোবানো অংশের উপর আলো ফেললেই ছাদের গায়ে আলোর বর্ণালি দেখতে পাবে (চিত্র ৩৬)।



চিত্র নং ৩৬ (পরীক্ষা নং ৩৬)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে আয়নার উপরে জলের অংশটা প্রিজমের মত ব্যবহার করে বিভিন্ন রঙের আলোককে বিভিন্ন কোণে প্রতিসরিত করায় বর্ণালি উৎপন্ন হয়েছে।

৩৭। চালের হাড়ি কেন পড়ে যায় না ?

প্রয়োজন ঃ এক হাঁড়ি চাল এবং একটি ছোরা।

পদ্ধতি ঃ সবাইকে বল অন্য কোন ভাবে স্পর্শ না করে শুধু ছোরা দিয়ে চালের হাঁড়ি উপরে তুলতে হবে।

কৌশল ঃ ছোরাটা চালের ভিতর সোজাসুজি অনেকটা ঢুকিয়ে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া কর। ছোরা চাল থেকে তুলে নাও, আবার চালের মধ্যে ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া কর। এভাবে কয়েকবার করে তারপর ছোরাটা বেশ জোরের সঙ্গে চালের ভিতর ঢুকিয়ে দাও। এখন ছোরাটা বাঁট ধরে উপরে ওঠালেই দেখবে চালের হাঁড়িটা ছোরার সঙ্গে আটকে উপরে উঠে এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ ছোরাটা বার বার চালে ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করার ফলে চালগুলি পরস্পর ঠাসাঠাসি হয়ে হাঁড়িটার গায়ে খুব শক্তভাবে লেগে থাকে। তখন জোর করে ছোরাটা চালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে উপরে টেনে তুললে ঘর্ষণ বলের জন্য চালের হাঁড়িটা ছোরার সঙ্গে আটকে থাকে।

৩৮। রূপালী ডিম জল থেকে তুললেই কালো !

প্রয়োজন ঃ একটি ডিম, একটি মোমবাতি এবং এক পাত্র জল।

পদ্ধতি ঃ পাত্রের জলের ভিতর দেখা যাচ্ছে একটা চকচকে রূপালী ডিম। মনে হচ্ছে রূপার তৈরি একটা ডিম কেউ জলের মধ্যে রেখে দিয়েছে। তোমার বন্ধুকে বল ডিমটা জল থেকে তুলতে। বন্ধু ডিমটা জলের উপরে ওঠাতেই দেখা গেল সেটা হয়ে গেছে ঘোর কালো ! তুমি মুচকে হেসে বন্ধুকে বললে, তোমার হাত লেগেই রূপার ডিমটা কালো হয়ে গেল !

প্রস্তুতি ঃ একটা সাধারণ ডিমকে জলন্ত মোমবাতির শিখায় ধর। বাতির ধোঁয়া লেগে আস্তে আস্তে সাদা ডিমটা ঘোর কালো হয়ে যাবে। এই কালো

ডিমটা জলে ডোবালেই চকচকে আর রূপালী দেখাবে; আবার জল থেকে তুললেই আগের মত কালো হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ ডিমটাকে ধোঁয়া লাগালে তার গায়ে কালো কার্বনের একটা সূক্ষ্ম আবরণ জমা হয়। ফলে ডিমটা জলে ডোবালে তার গায়ে কার্বনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বায়ুস্তর আবদ্ধ হয়ে থাকে, অর্থাৎ জল আর ডিমের গা এই দুয়ের মধ্যে বাতাসের একটা পাতলা স্তর থেকে যায়। আলোকরশ্মি জলের ভিতর দিয়ে গিয়ে এই বায়ুস্তরে পড়ে অর্থাৎ ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যেতে চায়। ফলে আলোকের আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। এই প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখে এসে লাগার জন্য ডিমটাকে চকচকে আর রূপালী মনে হয়। অবশ্য চোখ এমনভাবে রাখতে হবে যাতে আপতন কোণ জল ও বায়ুর সংকট কোণ (৪৯°) অপেক্ষা বড় হয়।

৩৯। বিকার অদৃশ্য হল কেন ?

প্রয়োজন ঃ একটি বড় ও একটি ছোট বিকার এবং গ্লিসারিন।

পদ্ধতি ঃ বড় বিকারের মধ্যে ছোট বিকার রাখ। ছোট বিকার বড় বিকারের ভিতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাবে। এখন বড় বিকারের মধ্যে এতটা গ্লিসারিন ঢাল যাতে ছোট বিকার গ্লিসারিনে সম্পূর্ণ ডুবে যায়। ছোট বিকার আর দেখা যাবে না।

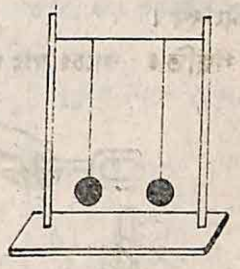
ব্যাখ্যা ঃ কাচ ও গ্লিসারিনের প্রতিসরাঙ্ক সমান এবং তারা স্বচ্ছ। সুতরাং তারা একই মাধ্যমের মত ব্যবহার করে। ফলে কাচের ছোট বিকারের আলোকের কোন প্রতিফলন বা প্রতিসরণ হয় না। এজন্য গ্লিসারিনের ভিতর দিয়ে কাচের ছোট বিকার দেখা যায় না।

৪০। দোলকের খেলা !

প্রয়োজন ঃ দুটো লোহা বা অন্য কিছুর ভারী বল বা পাথর এবং সুতো।

পদ্ধতি ঃ প্রত্যেক বল বা পাথরের সঙ্গে সুতো বেঁধে নাও। বল বা পাথর দুটো একই মাপের হওয়া চাই। সুতোর দৈর্ঘ্যও সমান হতে হবে।

দুটো খুঁটির সঙ্গে আর একটা সুতো বেশ টান করে টাঙ্গিয়ে দাও। এবার খুঁটির সুতো থেকে বল দুটো ঝুলিয়ে দাও। বল দুটো স্থির হলে যে-কোন একটা বল হাত দিয়ে দুলিয়ে দাও। বলটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলতে থাকবে। কিছুক্ষণ পরে দেখতে পাবে দ্বিতীয় বল বা দোলকও (যেটা এতক্ষণ স্থির ছিল) আস্তে আস্তে দুলতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় দোলকের দোলনের বিস্তার ক্রমশঃ বেড়ে যাবে কিন্তু প্রথমের দোলনের বিস্তার ক্রমশঃ কমতে থাকবে। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখবে প্রথমটার দোলন প্রায় থেমে গেছে আর দ্বিতীয়টার দোলনের বিস্তার খুব বেড়ে গেছে। এরপর আবার প্রথমটার দোলন বাড়তে থাকবে আর দ্বিতীয়টার দোলন কমতে থাকবে। এইভাবে দোলক দুটো পর্যায়ক্রমে একবার বেশী বিস্তারে আর একবার কম বিস্তারে দুলতে থাকবে। মাঝে মাঝে দুটো দোলকই সমানভাবে দুলবে। অনেকক্ষণ এভাবে দুলে দুলে শেষ পর্যন্ত দুটো দোলকই স্থির হয়ে যাবে (চিত্র ৩৭)।


চিত্র 37 (পরীক্ষা 40)

ব্যাখ্যা ঃ কোন কম্পনশীল বস্তুর প্রতি সেকেণ্ডে যতবার কম্পন বা দোলন হয়, তাকে বলে কম্পাঙ্ক। প্রত্যেক বস্তুর একটি নিজস্ব কম্পাঙ্ক থাকে। বস্তুটিকে আন্দোলিত করে ছেড়ে দিলে তা তার নিজস্ব কম্পাঙ্কে দুলতে থাকে। একে বলে বস্তুর স্বাভাবিক কম্পন। দোলকের কম্পাঙ্ক নির্ভর করে তার দৈর্ঘ্যের উপর। এখানে দুটো দোলকের দৈর্ঘ্য সমান বলে তাদের নিজস্ব কম্পাঙ্কও সমান। এখন দুটো বস্তুর নিজস্ব কম্পাঙ্ক সমান হলে তাদের একটাকে যদি দোলানো যায়, তবে অপরটিও দুলতে শুরু করে। একে বলে অনুনাদ বা রেজোন্যান্স। এখানে প্রথম দোলকের গতিশক্তি সুতোর মধ্যে দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে দ্বিতীয় দোলককে দোলায়। অনুনাদের ফলে কোন বস্তু কম্পনশীল হলে তার দোলনের বিস্তারও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এই কারণেই দ্বিতীয় দোলকের দোলনের বিস্তার ক্রমশঃ বাড়ে। আর প্রথম দোলকের গতিশক্তি দ্বিতীয় দোলককে দিয়ে দেওয়ায় প্রথম দোলকের দোলনের বিস্তার ক্রমশঃ কমে।

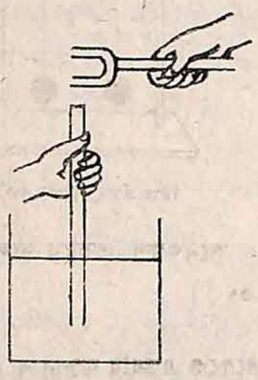
এরপর দ্বিতীয় দোলক প্রথমকে শক্তি সরবরাহ করতে থাকে, ফলে প্রথমের দোলনের বিস্তার বাড়তে থাকে আর দ্বিতীয়টার কমতে থাকে। এভাবে

কয়েকবার চলার পর উভয় দোলকেরই সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় (অর্থাৎ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে) ফলে দুটো দোলকই থেমে যায়।

৪১। অনুনাদের খেলা।

প্রয়োজন ঃ একটি লম্বা কাচের জার, একটি দুমুখ খোলা নল এবং একটি টিউনিং ফর্ক।

পদ্ধতি ঃ কাচের জার জলপূর্ণ কর। দুমুখ খোলা নলটা জারের জলের মধ্যে আংশিক ডুবিয়ে বাঁ-হাত দিয়ে ধরে থাক। টিউনিং ফর্ক বা স্বরশলাকার যে-কোন বাহুকে ছোট হাতুড়ি দিয়া সামান্য আঘাত করলে স্বরশলাকা কাঁপতে থাকে আর একটি ক্ষীণ শব্দ শোনা যায়। এবার কম্পমান স্বরশলাকার হাতল ডান হাতে করে নলের খোলা মুখের উপরে ধরা এখন নলটাকে জলের মধ্যে ওঠানামা করালে এক সময় জোর শব্দ শোনা যায় (চিত্র ৩৮)।



চিত্র 38 (পরীক্ষা 41)

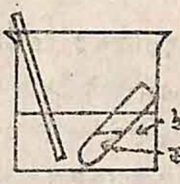
ব্যাখ্যা ঃ নলের ভিতর জলের উপরে যে বায়ুস্তম্ভ রয়েছে, তার একটা নিজস্ব কম্পাঙ্ক আছে। 'দোলকের খেলা' দেখ। এই কম্পাঙ্ক নির্ভর করে বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্যের উপর। বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্য বেশী হলে কম্পাঙ্ক কম হয়, আর দৈর্ঘ্য কম হলে কম্পাঙ্ক বেশী হয়। নলটাকে জলের মধ্যে ওঠা নামা করলে বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্যও বেশী বা কম হয়। এর ফলে এক সময় বায়ুস্তম্ভের কম্পাঙ্ক আর স্বরশলাকার কম্পাঙ্ক সমান হয়ে যায়, তখন অনুনাদের সৃষ্টি হয় এবং বায়ুস্তম্ভও স্বরশলাকার সমান কম্পাঙ্কে কাঁপতে থাকে। ফলে জোরালো শব্দ শোনা যায়।

৪২। জল থেকে বরফ!

প্রয়োজন ঃ একটা বিকার, একটা টেস্ট টিউব, একটা নল এবং একটু ইথার।

পদ্ধতি ঃ একটা বিকারে কিছু জলের মত তরল পদার্থ আছে। একটা টেস্টটিউবে একটু জল নিয়ে টেস্টটিউবটাকে বিকারের তরলে ডুবিয়ে রাখ (অংশিকভাবে)। সবাইকে বল, কোনরকম ঠাণ্ডা প্রয়োগ না করে টেস্টটিউবের জল কেউ বরফে পরিণত করতে পারে কি না?

কৌশল ঃ নল দিয়ে বিকারের তরলে ফুঁ দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখবে টেস্ট টিউবের জল বরফ হয়ে গেছে। বিকারের তরল কিন্তু জল নয়, ইথার। আগে থেকেই বিকারের কিছু ইথার রেখে দেবে (চিত্র ৩৯)।



চিত্র নং ৩৭ (পরীক্ষা নং ৪২)

ব্যাখ্যা ঃ ইথার খুব উদ্বায়ী পদার্থ অর্থাৎ অতি তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়। ইথারে ফুঁ দিলে বায়ুপ্রবাহের ফলে আরও দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় লীন তাপ চলে যাওয়ার ফলে, বিকারের অবশিষ্ট ইথার দ্রুত ঠাণ্ডা হয়। এতে টেস্ট টিউবের জলও খুব ঠাণ্ডা হয়ে বরফে পরিণত হয়। টেস্ট টিউবের জল আগে থেকে ঠাণ্ডা করে নিলে তাড়াতাড়ি বরফ তৈরি হয়।

ইথার অতি সহজ দাহ্য, সুতরাং এই খেলাটা দেখাবার সময় লক্ষ্য রাখবে ইথারের ধারে কাছে কোথাও যেন আগুন না থাকে। ইথারের বাষ্প আগুনের সংস্পর্শে এলে এমন কি বিস্ফোরণও ঘটতে পারে।

৪৩। না ছুঁয়ে সুতো কিভাবে কাটবে?

প্রয়োজন ঃ একটি বোতল, একটি আতস কাচ ও সুতো।

পদ্ধতি ঃ বোতলের ভিতরে ছিপি থেকে সুতো দিয়ে একটি ভারী জিনিষ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সবাইকে জিজ্ঞেস কর বোতল বা সুতো কোনভাবে স্পর্শ না করে ভারী জিনিসটাকে নীচে ফেলে দিতে পারবে কি না?

কৌশল ঃ একটা আতস কাচ দিয়ে সূর্যের আলো সূতোর উপরে এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত কর। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন লেগে সূতো পুড়ে যাবে আর ভারী জিনিষটা নীচে পড়ে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ আতস কাচ সূর্যের আলোকে যেমন ফোকাসে কেন্দ্রীভূত করে, সঙ্গে সঙ্গে তাপকেও ফোকাসে কেন্দ্রীভূত করে। ফলে সূতোর সেই জায়গাটা খুব গরম হয়ে আগুন ধরে যায়।

৪৪। ছবির ম্যাজিক!

প্রয়োজন ঃ একটি কাচের পাত বা প্লেট, কর্ক, দুটো বই, কিছু উলের কাপড় এবং একটু গ্লিসারিন।

পদ্ধতি ঃ কর্কটা সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত কর। বই দুটো কিছু ফাঁক করে টেবিলের উপরে রাখ। বই দুটোর মাঝের ফাঁকে কর্কের গুঁড়োগুলি ছড়িয়ে দাও। কাচের প্লেটটা সবাইকে দেখিয়ে বল—এতে কোন কিছু আঁকা নেই। জিজ্ঞেস কর রং তুলির সাহায্য ছাড়া প্লেটে কেউ কোন ছবি আঁকতে পারবে কিনা?

কৌশল ঃ আগে থেকে গ্লিসারিন আর তুলির সাহায্যে কাচের প্লেটে গাছ কি ফুল, কি তোমার মনের মত কোন-কিছুর ছবি এঁকে রাখ। ছবি আঁকার আগে প্লেটটা একদম শুকনো করে নেবে। গ্লিসারিনের ছবি অদৃশ্য থাকবে। প্লেটের যে পাশে ছবি এঁকেছ, তার বিপরীত দিক সবাইকে দেখালে কেউ ছবি আঁকা ধরতে পারবে না। এখন প্লেটটা বই দুটোর উপর সেতুর মত এমন ভাবে রাখ যাতে ছবি-আঁকা পিঠ নীচের দিকে থাকে। প্লেটের উপর দিক শুকনো পশমের কাপড় দিয়ে ঘষ। দেখবে কর্কের গুঁড়োগুলো যেন লাফিয়ে উঠে প্লেটের তলার দিকে লেগে থাকছে। কিছুক্ষণ ঘষার পর প্লেটটা তুলে ফুঁ দাও। গ্লিসারিন লাগান অংশ ছাড়া অন্য জায়গায় কর্কের গুঁড়োগুলো উড়ে যাবে কিন্তু গ্লিসারিন লাগান অংশে কর্কের গুঁড়োগুলো লেগে থাকবে। কর্কের গুঁড়োগুলো লেগে থাকার জন্য গ্লিসারিন দিয়ে আঁকা ছবি এবার স্পষ্ট বোঝা যাবে। যারা গ্লিসারিনের কথা জানে না, তারা এতে খুবই আশ্চর্য হবে।

ব্যাখ্যা ঃ কাচকে পশমের কাপড় দিয়ে ঘষলে কাচে ঋণ-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ফলে কর্কের গুঁড়োগুলো কাচের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে লাফিয়ে উপরে

উঠে। গ্লিসারিন চট্‌চটে বলে গ্লিসারিন লাগান অংশের গুঁড়োগুলো ফুঁ দিলেও উড়ে যায় না। ফলে ছবি স্পষ্ট দেখা যায়।

বিদ্যুতের পরীক্ষায় হাত এবং সব জিনিস যেন শুকনো থাকে। হাত এবং অন্য সবকিছু গরম করে নিলে ভাল হয়। জল বা জলীয় বাষ্পের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সহজেই চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঘর্ষণের দ্বারা যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। এইজন্য শীতকালে বিদ্যুতের পরীক্ষা ভাল হয় কারণ শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকে।

৪৫। কি করে পৃথক করবে ?

প্রয়োজন ঃ নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো, একটি চিরুণী আর উলের কাপড়।

পদ্ধতি ঃ টেবিলের উপর একটা কাগজ রেখে তাতে কিছু নুন পাতলা করে ছড়িয়ে দাও। নুনের উপর একটু গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে মিশিয়ে দাও। তোমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস কর। কেউ কোনভাবে স্পর্শ না করে নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো আলাদা করতে পারবে কিনা ?

কৌশল ঃ চিরুণী উলের কাপড় দিয়ে কয়েকবার ভাল করে ঘষে নাও। এখন চিরুণীটা গোলমরিচ আর নুনের মিশ্রণের উপরে ধরলেই দেখবে মরিচের গুঁড়োগুলো লাফিয়ে উঠে চিরুণীর গায়ে লেগে থাকছে। হাতে করে নুন থেকে গোলমরিচের গুঁড়ো আলাদা করা সহজ নয়। কিন্তু এত সহজেই যে দুটোকে পৃথক করা যায়, তা দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে।

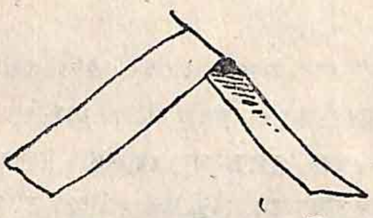
ব্যাখ্যা ঃ চিরুণীকে উল দিয়ে ঘষলে চিরুণীতে ঋন-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। তাই হালকা মরিচের গুঁড়ো চিরুণীর দিকে আকৃষ্ট হয়।

৪৬। বিদ্যুতের খেলা !

প্রয়োজন ঃ একটি বোতল, উলের কাপড়, সিল্কের কাপড় এবং কাগজ।

পদ্ধতি ঃ এক ফালি লম্বা কাগজ কেটে নাও। কাগজটা মাঝ-বরাবর দুভাঁজ কর। কাগজের দু'পিঠই উল দিয়ে বেশ করে ঘষ। কাগজের ফালিটা

মাঝের ভাঁজ বরাবর কোন কিছুর উপর ঝুলিয়ে দাও। দেখবে ফালির দু' বাহু দুদিকে ছড়িয়ে থাকছে, কিছুতেই এক হয়ে নীচে ঝুলে পড়ছে না (চিত্র ৪০)।



চিত্র চল্লিশ (পরীক্ষা ছেচল্লিশ)

এখন কাচের বোতলটা সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষে কাগজের ফালির নীচে ধর। কাগজের ফালির ছড়ানো বাহু দুটো এবার নীচে নেমে বোতলের গায়ে লেগে থাকবে (চিত্র ৪১)।

জলের কল অল্প একটু খুলে দাও, যেন সরু হয়ে জল পড়ে। এখন বোতলটা জলের ধারার কাছে আনলে দেখবে জলের ধারা বোতলের দিকে আকৃষ্ট হয়ে বেঁকে যাচ্ছে।



চিত্র একচল্লিশ (পরীক্ষা ছেচল্লিশ)

ব্যাখ্যা : কাগজকে পশম দিয়ে ঘষলে কাগজে ঋণ-তড়িৎ উৎপন্ন হয়। সম-তড়িৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, সেইজন্য কাগজের ফালির দুটো বাহু ছড়িয়ে থাকে, একত্র হয় না।

কাচকে রেশম দিয়ে ঘষলে কাচে ধন তড়িৎ উৎপন্ন হয়। বিষম-তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে, সেইহেতু ফালির দু'বাহু বোতলের গায়ে লেগে থাকে।

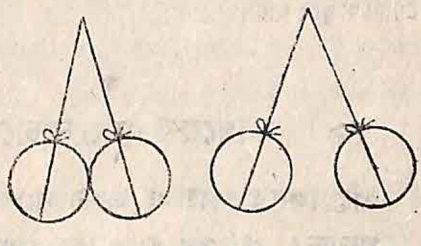
তড়িৎ আবেশের ফলে তড়িৎযুক্ত বস্তু নিস্তড়িৎ বস্তুকে আকর্ষণ করে। এইজন্য জলের ধারা বোতলের দিকে বেঁকে যায়।

৪৭। বেলুনকে সরাতে পার ?

প্রয়োজন : দুটো বেলুন, পশমের কাপড় ও লম্বা সুতো।

পদ্ধতি : লম্বা সুতো দিয়ে দুটো বেলুন বেঁধে একটা দড়ি থেকে ঝুলিয়ে দাও। বেলুন দুটো গায়ে গায়ে ঠেকে নীচে ঝুলে থাকবে। সবাইকে বল কেউ বেলুন দুটোকে ফাঁক করে ঝুলিয়ে রাখতে পারবে কিনা ?

কৌশল ঃ দুটো বেলুনই উল দিয়ে ভাল করে ঘষে দাও। দেখবে বেলুন দুটো দূরে সরে গিয়ে ফাঁক হয়ে ঝুলছে (চিত্র ৪২)।



চিত্র নং 42 (পরীক্ষা নং 47)

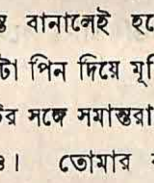
ব্যাখ্যা ঃ রাবারের বেলুনকে পশম দিয়ে ঘষলে বেলুন ঋণ তড়িতাবিষ্ট হয়। সম তড়িৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। দুটো বেলুনে এক জাতীয় তড়িৎ থাকার ফলে তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং দূরে সরে যায়।

৪৮। বাইরে থেকে ঘোরাতে পার ?

প্রয়োজন ঃ একটি কাচের গ্লাস, একটি কর্ক, একটি পিন, পশমী কাপড় আর কাগজ।

পদ্ধতি ঃ কাগজ কেটে একটা মানুষের মূর্তি বানাও। পেট থেকে মাথা পর্যন্ত বানালেই হবে। তুলি দিয়ে চোখ মুখ ইত্যাদি এঁকে নাও। এবার একটা পিন দিয়ে মূর্তির পেটের সঙ্গে কর্কটা এঁটে দাও। মূর্তি অনুভূমিক অর্থাৎ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে থাকবে। কাচের গ্লাস দিয়ে মূর্তিসহ কর্কটা ঢেকে দাও। তোমার বন্ধুদের বল গ্লাস না তুলে মূর্তিটা ইচ্ছামত ঘোরাতে পারবে কিনা ?

কৌশল ঃ মূর্তির মাথা যেদিকে ঘোরাতে চাও, ঠিক সেই বরাবর গ্লাসটা উল দিয়ে ভালভাবে কয়েকবার ঘষ, অর্থাৎ মাথা তোমার দিকে ঘোরাতে চাইলে গ্লাসের যেদিক তোমার সামনে আছে, সেখানে ঘষতে হবে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দেখতে পাবে মাথা তোমার খুশিমত দিকে অর্থাৎ যেখানে তুমি ঘষেছ, সেদিকে ঘুরে গেছে (চিত্র ৪৩)।



চিত্র 43(পরীক্ষা 48)

ব্যাখ্যা ঃ কাচের গ্লাসকে উল দিয়ে ঘষলে গ্লাসে ঋণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আর এই বিদ্যুৎ গ্লাসের যেখানে ঘষেছ, শুধু সেখানে আবদ্ধ থাকে, কারণ কাচ বিদ্যুৎতের কুপরিবাহী।

এখন তড়িৎ আবেশের ফলে মূর্তির মাথা গ্লাসের যেখানে তড়িৎ উৎপন্ন হয়েছে, সেদিকে ঘুরে যায়।

৪৯। কাগজের ব্যাঙ নাচাতে পার ?

প্রয়োজন ঃ দুটো বই, একটা কাচের প্লেট বা পাত আর পশমী কাপড়।

পদ্ধতি ঃ টেবিলের উপর কিছু তফাতে দুটো বই রাখ। কাগজ কেটে কয়েকটা ব্যাঙ তৈরি কর। রং তুলি দিয়ে ব্যাঙের চোখ মুখ এঁকে নিতে পার। কাগজের ব্যাঙগুলো বইয়ের ফাঁকে রাখ। বই দুটোর উপর কাচের প্লেটটা রাখ। এবার সবাইকে জিজ্ঞেস কর ব্যাঙগুলোকে কোনভাবে স্পর্শ না করে কেউ কি সেগুলোকে কাচের প্লেট পর্যন্ত লাফালাফি করাতে পারবে ?

কৌশল ঃ উল দিয়ে কাচের প্লেটের উপরিভাগ বেশ কয়েকবার ঘষে দাও। সবাই দেখবে কাগজের ব্যাঙগুলো সত্যিকারের ব্যাঙের মত লাফাতে শুরু করেছে (চিত্র ৪৪)।



চিত্র নং 44 (পরীক্ষা নং 49)

ব্যাখ্যা ঃ কাচকে উল দিয়ে ঘষাতে কাচ ঋণ-তড়িতাবিষ্ট হচ্ছে। ফলে কাগজের ব্যাঙগুলো আকৃষ্ট হয়ে লাফালাফি শুরু করছে।

৫০। রাবারের হাঁস খুশিমত চালাতে পার ?

প্রয়োজন ঃ একটি রাবারের হাঁস, একটা মোটা লোহার পিন বা সূচ, একটা দণ্ড চুম্বক, একটা লাঠি আর এক গামলা জল।

পদ্ধতি ঃ লোহার পিন বা সূচকে দণ্ড চুম্বকের সাহায্যে বেশ কয়েকবার ঘষ। চুম্বকের যেকোন এক মেরুর দ্বারাই ঘষবে। আর প্রতিবার পিন বা সূচের একটা নির্দিষ্ট প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘষবে ; একবার এদিকে আর একবার ওদিকে ঘষবে না। এর ফলে পিন বা সূচ চুম্বকে পরিণত হবে। পিনের যে প্রান্তে ঘর্ষণ শেষ হবে, সেই প্রান্তে দণ্ড চুম্বকের ঘর্ষণকারী মেরুর বিপরীত মেরু উৎপন্ন হবে। এবার পিন সূচের সরু দিকটা রাবারের হাঁসের মাথায় ঢুকিয়ে দাও। মোটা দিকটা সামান্য একটু বেরিয়ে থাকবে। দণ্ড চুম্বকটা লাঠির ভেতর

গর্ত করে ঢুকিয়ে দাও ; এমন ভাবে ঢোকাবে যাতে পিন বা সূচের মোটা দিক সেই মেরুদণ্ড চুম্বকের তার বিপরীত মেরু সামান্য একটু বেরিয়ে থাকে। এই কাজগুলো আগে থেকে করে রেখে সবার সামনে হাঁসটা গামলার জলে ভাসিয়ে দাও। সবাইকে বল—কেউ হাঁসটাকে গামলার জলে ইচ্ছামত যে-কোন দিকে চালাতে পারবে কিনা ?

কৌশল ঃ লাঠির যে প্রান্তে দণ্ড চুম্বক ঢোকানো আছে, সেই দিকটা হাঁসের কাছে নিয়ে গেলে দেখবে হাঁস লাঠির দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এভাবে লাঠি যেদিকে নিয়ে যাবে, হাঁসও সেদিকে যাবে (চিত্র ৪৫)।



চিত্র ৪৫ (পরীক্ষা ৫০)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে পিন বা সূচের মোটা দিক যেটা মেরুদণ্ড চুম্বকের বাইরের দিক, তার বিপরীত মেরু হওয়াতে দণ্ডচুম্বক পিন বা সূচকে আকর্ষণ করে। তোমরা তো জানই, চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ফলে লাঠি যেদিকে নিয়ে যাবে, হাঁসটাও সেদিকে যাবে।

৫১। মুখ দিয়ে জল তুলতে পারবে ?

প্রয়োজন ঃ একটা বোতল ও তার ছিপি, কাচের নল আর রাবারের নল।

পদ্ধতি ঃ ছিপিতে ছিদ্র করে তার মধ্যে কাচের নল বায়ুনিরুদ্ধ ভাবে ঢোকাও। কাচের নলের বাইরের দিকে রাবারের নল আঁটকে দাও। এবার বোতল সম্পূর্ণরূপে জলে ভর্তি করে ছিপিটা বোতলের মুখে বায়ুনিরুদ্ধ ভাবে আঁটকে দাও। (রাবারের নল বোতলের বাইরে থাকবে।) সবাইকে বল তাদের মধ্যে কেউ রাবারের নলের মুখে মুখ দিয়ে বোতল থেকে জল খেতে পারবে কিনা ? কিন্তু কেউই পারবে না। তখন তাদের কাছে জানতে চাও—কেউ কি এমন ব্যবস্থা করতে পারে, যাতে এভাবে জল খাওয়া যায় ?

কৌশল ঃ বোতলের ছিপিটা বোতলের মুখে একটু আলগা করে লাগাও। এবার অনায়াসে রাবারের নল দিয়ে বোতলের জল খেতে পারবে (চিত্র ৪৬)।

ব্যাখ্যা ঃ বোতল সম্পূর্ণরূপে জলভর্তি। বোতলে কোন বাতাস নেই, ছিপি বায়ুনিরুদ্ধভাবে আঁটকানো। এই অবস্থায় রাবারের নলে মুখ দিয়ে জল শোষণ করার চেষ্টা করলে কাচের নলে বায়ুর চাপ কমে যায়, কিন্তু বোতলে বায়ু না থাকাতে জল ওঠে না। ছিপি আলগা করলে বোতলের সঙ্গে বাইরের বাতাসের সংযোগ হয়. ফলে বাইরের বাতাসের চাপে নলে জল ওঠে।



চিত্র ষোল (পরীক্ষা একান্ন)

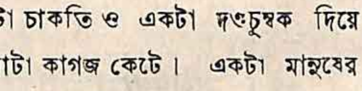
রাবারের নল না ব্যবহার করালেও চলে, কিন্তু কাচের নলে যাতে মুখ কেটে না যায়, সে বিষয়ে সাবধান।

৫২। শত্রু মিত্র বুঝতে পারা পুতুল!

প্রয়োজন ঃ দুটো দণ্ড চুম্বক, মোটা কাগজ, রঙিন কাগজ আর সুতো।

পদ্ধতি ঃ মোটা কাগজ কেটে চারটে উপবৃত্তাকার (ডিমের মত) চাকতি তৈরি কর। দুটো চাকতির মাঝখানে একটা দণ্ডচুম্বক সুতো দিয়ে আটকে দাও। রঙিন কাগজ দিয়ে চাকতি দুটো মুড়ে দাও যাতে বাইরে থেকে চুম্বকটা টের না পাওয়া যায়। একইভাবে আর দুটো চাকতি ও একটা দণ্ডচুম্বক দিয়ে আর একটা জোরা চাকতি তৈরি কর মোটা কাগজ কেটে। একটা মানুষের মূর্তি তৈরি করে সেটা প্রথম জোড়া চাকতির উপরে ঠিক মাঝখানে বসিয়ে দাও। আঁঠা বা সুতো দিয়ে আটকে দিও। জোরা চাকতির ভিতরের চুম্বকের উত্তর মেরু যেদিকে, মূর্তির মুখও যেন সেদিকে থাকে। এই মূর্তির নাম যেন 'ক'।

আর একটা মোটা কাগজ বা পিজবোর্ডের দুপাশে দুটো মানুষের মূর্তি এঁকে নাও। এই পিজবোর্ডটা দ্বিতীয় জোরা চাকতির উপরে মাঝখানে বসিয়ে আটকে দাও। পিজবোর্ডের যে পিঠের দিকে ছবির নীচে চুম্বকের দক্ষিণ মেরু আছে, তার নাম মনে কর 'খ' এবং অন্য পিঠের ছবির নাম 'গ'। প্রথম জোড়া চাকতির মূর্তিটা সুতো দিয়ে কোন কিছু থেকে ঝুলিয়ে দাও। এখন সবাইকে বল ক-এর বন্ধু হল খ আর



চিত্র 17 (পরীক্ষা 52)

শত্রু হল গ। ক তার শত্রু-মিত্র চিনতে পারে ! তোমার কথার প্রমাণ চাইলে তুমি দ্বিতীয় জোড়া চাকতিটা এনে ঝুলন্ত ক-এর সামনে বসিয়ে দাও। দেখবে ক-এর সামনে খ থাকলে ক খ-এর দিকে মুখ করে থাকে, কিন্তু গ থাকলে ক মুখ ঘুরিয়ে নেয় (চিত্র ৪৭)।

ব্যাখ্যা ঃ ক-এর সামনে আছে চুম্বকের উত্তর মেরু আর খ-এর সামনে আছে চুম্বকের দক্ষিণ মেরু। বিপরীত মেরুর আকর্ষণের ফলে ক খ-এর দিকে মুখ করে থাকে। কিন্তু গ-এর সামনে আছে উত্তর মেরু। এক্ষেত্রে সমমেরুর বিকর্ষণের জন্য ক মুখ ঘুরিয়ে থাকে।

৫৩। জলে ডোবালেও হাত ভেজে না !

প্রয়োজন ঃ এক গামলা জল, একটা মুদ্রা এবং লাইকোপোডিয়াম পাউডার।

পদ্ধতি ঃ গামলার জলে মুদ্রাটা ডুবিয়ে দাও। এবার বন্ধুদের বল জলে হাত ডুবিয়ে মুদ্রাটা তুলে আনতে হবে। গ্লাভস্ বা ঐজাতীয় কিছু পরা চলবে না, অথচ হাতও ভিজবে না ! কেউ পারবে ?

কৌশল ঃ আগে থেকেই হাতে ভাল করে লাইকোপোডিয়াম পাউডার মাখিয়ে রাখ। হাত দেখলেও পাউডারের কথা কেউ বুঝতে পারবে না। এবার বন্ধুদের সামনে জল থেকে মুদ্রাটা হাত দিয়ে তুলে নাও, হাত একটুও ভিজবে না।

ব্যাখ্যা ঃ লাইকোপোডিয়ামের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ হাতের চারপাশে এমন একটি আবরণ সৃষ্টি করে যে, হাত জলের সংস্পর্শে আসতে পারে না,—ফলে ভেজে না।

৫৪। উত্তর ঠিক হলেই আলো জ্বলবে !

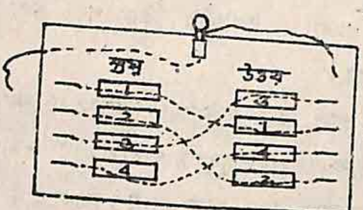
প্রয়োজন ঃ একটা পিজবোর্ডের বাক্স, একটা টর্চের বাক্স, ব্যাটারি ও বৈদ্যুতিক তার।

পদ্ধতি ঃ দশটা ছোট ছোট কাগজের টুকরায় দশটা প্রশ্ন লেখ। অন্য দশটা কাগজের টুকরায় এই প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ। প্রশ্ন লেখা কাগজগুলো পিজবোর্ডের বাক্সের বাঁদিকে উপর থেকে নীচে পরপর আঁঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও।

উত্তরগুলো বাক্সের ডানদিকে এলোমেলোভাবে উপর থেকে নীচে লাগাও অর্থাৎ প্রথম প্রশ্নের উত্তর হয়ত থাকবে চতুর্থ স্থানে, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর নবম স্থানে —এই রকম। প্রত্যেক প্রশ্নের বাঁদিকে বাক্সে দুটো ছিদ্র কর। প্রতি উত্তরের ডানদিকেও দুটো ছিদ্র কর। বারটা বৈদ্যুতিক তারের টুকরা নাও। প্রত্যেক বৈদ্যুতিক তারের উভয় প্রান্তের কিছু অংশ থেকে প্লাস্টিকের আবরণ কেটে তার বার করে নাও।

এবার একটা বৈদ্যুতিক তারের একপ্রান্ত প্রথম প্রশ্নের বাঁদিকের দুটো ছিদ্রের মধ্যে বাঁধ। অন্য প্রান্ত বাঁধ প্রথম প্রশ্নের সঠিক উত্তরের ডাকদিকের দুটো ছিদ্রের মধ্যে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক প্রশ্ন ও তার সঠিক উত্তর তার দিয়ে যুক্ত কর।

বাকি দুটো তারের একটার একপ্রান্ত ব্যাটারির নীচের সঙ্গে আটকে নাও। অন্য তারের একপ্রান্ত বাল্বের গোড়ার সঙ্গে বেঁধে দাও। বাল্বটা ব্যাটারির মাথায় কার্বন দণ্ডের উপরে কোনভাবে আটকাও। বাক্সের উপর দিকে মাঝখানে একটা ছিদ্র কর। বাল্ব এই ছিদ্রের মধ্যে এমনভাবে রাখ যাতে বাক্সের উপরে বাল্ব আর নীচে ব্যাটারি থাকে। ব্যাটারির নীচের সঙ্গে আটকান তারের অন্য প্রান্ত যে কোন প্রশ্নের বাঁ-দিকে বাঁধা তারের সঙ্গে ঠেকাও। এবার যদি বাল্বের সঙ্গে বাঁধা তারের অন্য প্রান্ত সঠিক উত্তরের ডানদিকে বাঁধা তারের সঙ্গে ছোঁয়ানো যায় তবেই আলো জ্বলবে। উত্তর ভুল হলে আলো জ্বলবে না। (চিত্র ৪৮)



চিত্র 48 (পরীক্ষা 54)

ব্যাখ্যা ঃ একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে, উত্তর সঠিক হলে তবেই বৈদ্যুতিক বর্তনী সম্পূর্ণ হচ্ছে, ফলে আলো জ্বলছে। উত্তর ভুল হলে বর্তনী সম্পূর্ণ হচ্ছে না, আর আলোও জ্বলছে না।

৫৫। টিকিট অদৃশ্য হল কেন ?

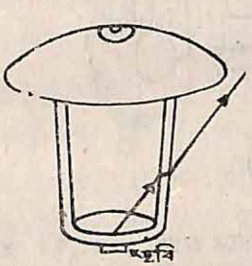
প্রয়োজন ঃ একটা টিকিট, একটা কাচের গ্লাস,, একটা চায়ের প্লেট আর জল।

পদ্ধতি ঃ টেবিলে একটা টিকিট রেখে তার উপর কাচের গ্লাস চাপা দাও। গ্লাসের মুখ প্লেট দিয়ে বন্ধ করলেও পাশ থেকে গ্লাসের ভিতর দিয়ে টিকিট দেখা

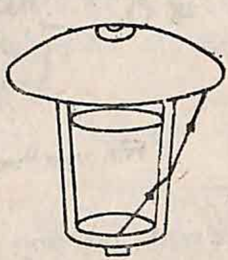
যাবে। এখন সবাইকে জিজ্ঞেস কর—কি করলে কোন আড়াল না দিয়েও পাশ থেকে টিকিট আর দেখা যাবে না?

কৌশল: প্লেট তুলে নিয়ে গ্লাসে জল ভর, তারপর প্লেট দিয়ে গ্লাসের মুখ আবার ঢেকে দাও। এবার কিন্তু পাশ থেকে গ্লাসের ভিতর দিয়ে টিকিট আর দেখা যাবে না।

ব্যাখ্যা: আলোকের প্রতিসরণের জন্য এরকম হচ্ছে। ছবি দেখলেই জিনিসটা পরিষ্কার হবে। প্রথম ক্ষেত্রে গ্লাস যখন জলশূন্য থাকে (চিত্র ৪৯)। আলোকরশ্মি টিকিট থেকে বাতাসের মধ্য দিয়ে এসে গ্লাসের কাচের ভিতর



চিত্র 49 (পরীক্ষা 55)



চিত্র 50 (পরীক্ষা 55)

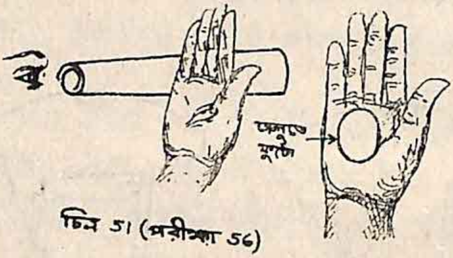
দিয়ে গিয়ে আবার বাতাসে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে কাচে আপতিত রশ্মি আর কাচ থেকে বাতাসে নির্গত রশ্মি পরস্পর সমান্তরাল। এই রশ্মি চোখে এসে পড়ায় আমরা টিকিটটা দেখতে পাচ্ছি।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গ্লাস জলপূর্ণ থাকলে (চিত্র ৫০) আলোকরশ্মি জলের মধ্য দিয়ে এসে গ্লাসের কাচে প্রবেশ করে, তারপর আবার কাচ থেকে বাতাসে প্রবেশ করে। আলোকরশ্মি ঘন-মাধ্যম থেকে লঘু-মাধ্যমে প্রবেশ করলে, আয়তন কোণের চেয়ে প্রতিসরণ কোণ বড় হয় অর্থাৎ প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। এখানে প্রথমে জল থেকে কাচ, আর পরে কাচ থেকে বায়ু দু'বার প্রতিসরণের ফলে শেষ পর্যন্ত বায়ুতে নির্গত রশ্মি কাচে আপতিত রশ্মির তুলনায় অনেকটা উপড়ে উঠে যায়, কারণ জলের তুলনায় বায়ু লঘু মাধ্যম। বায়ুতে নির্গত রশ্মি উপরে উঠে যাওয়ায় তা প্লেটে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আর চোখে পৌছতে পারে না। এইজন্য গ্লাস জলপূর্ণ করলে আর আমরা টিকিট দেখতে পাই না।

৫৬। তালুর মাঝখানে ফুটো ?

প্রয়োজন ঃ একটুকরো কাগজ।

পদ্ধতি ঃ কাগজটা নলের মত করে পাকিয়ে নাও। বাঁ-হাতে কাগজের নলটা ধরে নলের এক প্রান্ত বাঁ-চোখের সামনে রাখ। ডান হাতের তালু নলের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখ। এবার দু'চোখ মেলে সামনের দিকে তাকাও—মনে হবে তালুর মধ্যে একটা ফুটো। তালুকে এগিয়ে বা পেছিয়ে এমন জায়গায় রাখা যায়



চিত্র ১। (পরীক্ষা ৫৬)

তাতে মনে হবে ফুটোটা যেন তালুর মাঝখানে রয়েছে। হাতের তালুর দিকে তাকালে কিন্তু ফুটো দেখা যাবে না; দূরের দেওয়ালের দিকে তাকালে তবেই ফুটো বোঝা যাবে (চিত্র ৫১)।

ব্যাখ্যা ঃ বাঁ-চোখের জন্য ডানদিকে নলের ফুটো দেখা যায়, আর ডান চোখের জন্য বাঁ-দিকে ডান হাতের তালু দেখা যায়। আবার বাঁ-চোখ নলের ভিতর দিয়ে দূরের জিনিস দেখছে। এতে বাঁ-চোখের লেন্স দূরের জিনিস দেখবার মত করে নিজেকে পরিবর্তিত করে। একে বলে অ্যাকোমোডেশান। দু চোখের অ্যাকোমোডেশান একই রকম হয় ফলে ডান চোখের লেন্সও দূরের জিনিস দেখবার মত পরিবর্তিত হয়। এখন ডান হাতের তালু রয়েছে সামনে, কাজেই ডান চোখে তালুর একটা ঝাপসা ছবি দেখা যাবে অর্থাৎ বাঁ-চোখ দেখছে পরিষ্কারভাবে কিন্তু ডান চোখ দেখছে ঝাপসা ভাবে।

এর ফলে মস্তিষ্ক দুটো ছবি মেলাতে পারে না, আর বাঁ-চোখ যেখানে দেখছে ফুটো, ডান চোখ সেখানেই দেখছে হাতের তালু। ফলে মনে হয় ডান হাতের তালুর মধ্যেই রয়েছে ফুটোটা। দুচোখে তাকালেই এরকম মনে হয়, একচোখে তাকালে কিন্তু এরকম তালুর ভিতর ফুটো মনে হবে না। ('পাখি খাচার ভিতর এল কি করে' ৩২নং পরীক্ষা দেখ।)

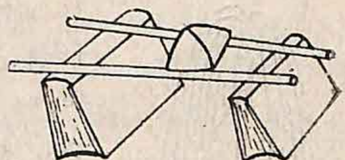
৫৭। নিজে থেকে উপরে উঠছে!

প্রয়োজন ঃ মোটা কাগজ, একটা বড় আর একটা ছোট বই আর দুটো কাঠি।

পদ্ধতি ঃ মোটা কাগজ কেটে দুটো কোণ (cone) বা শঙ্কু তৈরি কর। (এখানে কোণ বলতে অ্যাঙ্গল বোঝাচ্ছে না)। ফানেলের লম্বা ডাঁটিটা ভেঙ্গে ফেললে যেরকম দেখতে হয়, কোণ হচ্ছে সেরকম। কোণ দুটো আঠা আর কাগজ দিয়ে জুড়ে দাও।

বই দুটো টেবিলের উপর এমন ভাবে রাখ যেন তাদের পেছনের দিক উপরে থাকে। একটা বই উঁচু আর একটা বই নীচু হওয়া চাই। কাঠি দুটো বই দুটোর উপর এমন ভাবে রাখ যেন কাঠি দুটোর মাঝখানের ফাঁক নীচু দিকে কম আর উঁচু দিকে বেশী থাকে।

এবার জোড়া কোণকে কাঠি দুটোর উপরে নীচু দিকে রাখ। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখবে জোড়া কোণটা কাঠি দুটোর উপর দিয়ে নীচু বই থেকে উঁচু বইয়ের দিকে চলতে শুরু করেছে (চিত্র ৫২)।



চিত্র নং ৫২ (পরীক্ষা নং ৫৭)

ব্যাখ্যা ঃ জোড়া কোণটা যখন নীচু বইয়ের উপরে ছিল, তখন তার দুই প্রান্ত কাঠি দুটো থেকে অনেকটা বাইরে বেরিয়ে ছিল। উঁচু দিকে কাঠি দুটোর মাঝখানে ফাঁক বেশী, ফলে কোণটা যখন উঁচু বইয়ের দিকে যায়, তখন তার উভয় প্রান্ত ক্রমশঃ কাঠি দুটোর কাছে চলে আসে। ফলে নীচু বইয়ের উপর থাকার সময় জোড়া কোণের যেই স্থান দুটো কাঠি দুটোর সঙ্গে লেগে থাকে, উঁচু বইয়ের উপরে থাকার সময়ে আর সেই স্থান দুটো কাঠি দুটোর সঙ্গে লেগে থাকে না।

এখন পরীক্ষাটা করে দেখলেই বুঝতে পারবে—জোড়া কোণ যখন উঁচু বইয়ের দিকে যায়, তখন আসলে (তার ভারকেন্দ্র) নীচের দিকে নেমে আসে, যদিও আমাদের মনে হয় তা উপরের দিকে উঠছে।

৫৮। চাপ দিয়ে জোড়া লাগানো!

প্রয়োজন ঃ একটা সীসার নিরেট চোঙ এবং একটি ছুরি।

পদ্ধতি ঃ ছুরি দিয়ে সীসার চোঙটা দুটুকরো কর। এবার টুকরো দুটোকে

মুখোমুখি চেপে ধরলেই তারা জোড়া লেগে যাবে। এত জোরে তারা আটকে যাবে যে তাদের টেনে আলাদা করা বেশ কঠিন হবে।

ব্যাখ্যা ঃ সীসার অণুদের মধ্যে আকর্ষণ বল এত বেশী যে, তাদের খুব কাছাকাছি আনলে এই বলের দরুণ তারা আটকে যায়। আর সীসা খুব নরম বলে চাপ দিয়ে চোঙের দুটো টুকরোর অণুদের খুব কাছাকাছি আনা সম্ভব।

৫৯। আশ্চর্য ফোয়ারা!

প্রয়োজন ঃ একটা বোতল ও তার কর্ক এবং একটা নল।

পদ্ধতি ঃ বোতলে আধ বোতল জল নাও। ছিপিতে ছিদ্র করে তাতে নলটা ঢুকিয়ে দাও। ছিপি দিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ কর। ছিপি এবং নল যেন বায়ুনিরুদ্ধ ভাবে আঁটকানো থাকে। নল বোতলের নীচ পর্যন্ত যাবে।


চিত্র ৫৩ (পরীক্ষা ৫৯)

এবার নলের মুখে জোরে ফুঁ দাও, ফুঁ দিয়ে মুখ সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নলের মুখ আঙ্গুল দিয়ে কিছুক্ষণ চেপে ধরে থাক। এখন আঙ্গুল সরিয়ে নিলে দেখবে নলের মুখ দিয়ে ফোয়ারার মত জল বেরিয়ে আসছে (চিত্র ৫৩)।

ব্যাখ্যা ঃ ফুঁ দিলে বোতলের জলে বাতাস প্রবেশ করে ; তারপর এই বাতাস হালকা বলে জলের উপরে চলে যায়। ফলে বোতলের ভিতরে জলের উপরের বাতাসের চাপ বেড়ে যায়। বোতলের মুখ থেকে আঙ্গুল সরিয়ে নিলে এই অতিরিক্ত বাতাসের চাপ ঠেলা দিয়ে বোতলের জল নলের মুখ দিয়ে ফোয়ারার মত বাইরে বার করে দেয়।

৬০। ডিমকে দাঁড় করাতে পার?

প্রয়োজন ঃ একটা কাচা ডিম।

পদ্ধতি ঃ সবাইকে জিজ্ঞেস কর একটা কাচা ডিমকে কোনভাবে না ভেঙে বা বাহিরাকৃতির কোন পরিবর্তন না করে, কেউ কি টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবে?

কৌশল ঃ ডিমটা কিছুক্ষণ সজোরে ঝাঁকাও। এর ফলে ডিমের কুসুমের চারপাশে যে পাতলা আবরণ থাকে, সেটা ভেঙে কুসুম চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে। এখন ডিমের মোটা দিকটা টেবিলে বসিয়ে কিছুক্ষণ হাত দিয়ে ধরে থাক। একটু পরে হাত সরিয়ে নিলেও ডিমটা পড়ে যাবে না, দাঁড়িয়েই থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ ডিমটাকে দাঁড় করিয়ে রাখলে কুসুম, যেটা সাদা অংশের চেয়ে ভারী, ফলে ধীরে ধীরে নীচে থিতিয়ে পড়ে। এর ফলে ডিমের ভারকেন্দ্র নীচে নেমে আসে, আর ডিমটাও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

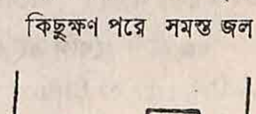
৬১। জলকে উপর দিকে তুলতে পার ?

প্রয়োজন ঃ একটি থালা বা গামলা, একটি গ্লাস, একটি মুদ্রা এবং জল।

পদ্ধতি ঃ থালার এক ধারে মুদ্রা রাখ, থালায় অল্প জল ঢাল যাতে মুদ্রা জলের ভিতর ডুবে থাকে। এবার সবাইকে বল হাতের একটা আঙ্গুলও না ভিজিয়ে কেউ কি মুদ্রাটি (মনে কর আধুলি) হাত দিয়ে তুলে আনতে পারে ?

কৌশল ঃ একটা গ্লাসের মধ্যে কিছু জলন্ত কাগজ ফেলে দিয়েই হোক বা অন্য কোন ভাবেই হোক, গ্লাসটা একটু গরম কর, দেখবে গ্লাস যেন ফেটে না যায়। এবার গ্লাসটা গরম থাকতে থাকতেই তা থালার জলের উপর উপুড় করে বসিয়ে দাও যেন আধুলিটা গ্লাসের বাইরে থাকে।

একটু অপেক্ষা করলে দেখবে থালার সব জল ধীরে ধীরে গ্লাসের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। ফলে গ্লাসের জল উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে সমস্ত জল গ্লাসে চলে গেলে আধুলিটা আঙ্গুল না ভিজিয়েই তুলে আনতে পারবে (চিত্র নং ৫৪)।



চিত্র ৫৪ (পরীক্ষা ৬১)

ব্যাখ্যা ঃ গ্লাসটা গরম করায় গ্লাসের ভিতরের বাতাসও গরম হয়, ফলে আয়তনে প্রসারিত হয়ে কিছু বাতাস গ্লাস থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। গ্লাসটা উপুড় করে রাখার পর আস্তে আস্তে ভিতরের বাতাস আগের মত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু এখন গ্লাসের ভিতর আগের চেয়ে কম বাতাস থাকায় গ্লাসের ভিতরের বাতাসের চাপ কমে যায়। এতে বাইরের বাতাসের চাপে গ্লাসের ভিতর বাইরে থেকে জল প্রবেশ করে।

৬২। কতটা সময় লাগবে ?

প্রয়োজন ঃ একটা লম্বা পাত্র যার নীচের দিকে একটা নল লাগানো আছে যা খুশিমত খোলা বা বন্ধ করা যায়, একটা গ্লাস এবং জল।

পদ্ধতি ঃ গ্লাসের জল ঢেলে লম্বা পাত্রটা একদম ভর্তি কর। মনে কর পাত্রে কুড়ি গ্লাস জল ধরে। এবার নল খুলে খালি গ্লাস পাত্রের জলে ভর্তি কর। মনে কর গ্লাস পূর্ণ হতে সময় লাগল পনেরো সেকেণ্ড।

পাত্রটা আবার জলে ভর্তি করে সকলকে জিজ্ঞেস কর নল খুলে দিলে ভরতি পাত্র খালি হতে কত সময় লাগবে ?

সবাই হয়তো ভাববে পাত্র থেকে এক গ্লাস জল বেরোতে সময় লাগবে পনরো সেকেণ্ড, সুতরাং ভরতি পাত্রের কুড়ি গ্লাস জল বেরোতে সময় লাগবে ২০ × ১৫ সেকেণ্ড = ৩০০ সেকেণ্ড বা = ৫ মিনিট।

কিন্তু করে দেখলে দেখবে সময় লাগছে অনেক বেশী ; এমন কি দ্বিগুণ সময় অর্থাৎ দশ মিনিটও বলা যেতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ কোনও মুখ খোলা পাত্রের ছিদ্র দিয়ে যে বেগে ভিতর থেকে তরল পদার্থ বেরিয়ে আসবে, তা নির্ভর করে ছিদ্র হতে তরলের উপরিতলের উচ্চতার উপর। উচ্চতা যত বেশী হবে, গতিবেগও তত বাড়বে। এখানে প্রথম গ্লাস ভর্তি করার সময় উচ্চতা অনেক বেশী ছিল, যতই পাত্র থেকে জল বেরিয়ে আসে, ততই জলের উচ্চতা কমে যায়, ফলে পরের গ্লাসগুলো ভরতি হতে সময় ক্রমশঃ বেশী লাগে। কাজেই পাত্র সম্পূর্ণ খালি হতে সময় লাগে অনেক বেশী।

বিজ্ঞানী টরিসেলি এই গতিবেগের (যাকে বলা হয় 'ভেলোসিটি অব এফ্লাক্স' —Velocity of Efflux) সূত্র বার করেন ১৬৪৪ সালে। টরিসেলির সূত্রানুযায়ী কোনও ছিদ্র দিয়ে কোন তরলের নিষ্ক্রমণের গতিবেগ কোন বস্তু তরলের উপরিতল থেকে ছিদ্র পর্যন্ত মুক্তভাবে পতিত হলে যে গতিবেগ লাভ করবে, তার সমান। অবশ্য তরলের ঘর্ষণ বা ভিসকোসিটির জন্য প্রকৃত গতিবেগ-এর চেয়ে কিছু কম হয়।

এই গতিবেগ তরলের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে না, উচ্চতা সমান হলে পারদ ও জল একই বেগে পড়ে। গতিবেগ অবশ্য অভিকর্ষের উপর নির্ভর করে, অভিকর্ষ বেশী হলে বেগও বেশী হয় ; চাঁদের অভিকর্ষ কম বলে চাঁদে গতিবেগ কম ; ফলে চাঁদে পাত্র খালি হতে সময় লাগে বেশী।

৬৩। বাতাসের চাপের খেলা !

প্রয়োজন ঃ ছুটো হাতলওয়ালা রাবারের বাটি।

পদ্ধতি ঃ একটা হাতলওয়ালা রাবারের বাটি, কাচের প্লেট বা মসৃণ টেবিলের উপর রেখে চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করে টেবিলের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। এখন বাটিটা টেনে তুলতে গেলে দেখবে তা যেন আঠার মত টেবিলের সঙ্গে আটকে আছে। বেশ জোরে টানলে তবেই বাটিটা তুলতে পারবে।

এবার ছুটো রাবারের বাটি মুখোমুখি ধরে ছুহাত দিয়ে চেপে চ্যাপ্টা করে মিলিয়ে দাও। বাটি ছুটো শক্তভাবে লেগে যাবে। ছুজনে ছুদিক থেকে বাটির হাতল ধরে খুব শক্তি প্রয়োগ করে টানলে তবেই বাটি ছুটো ছাড়ানো যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ রাবারের বাটিকে টেবিলের উপর রেখে চেপে ধরলে তার ভিতরের বাতাস বেরিয়ে যায়, ফলে বাইরের বাতাসের চাপে সেটা টেবিলে আটকে থাকে।

একইভাবে বাটি ছুটোকে মুখোমুখি চেপে ধরলে তাদের ভিতরের বাতাস বেরিয়ে আসে, আর বাইরের বাতাসের চাপে তারা দৃঢ়ভাবে আটকে যায়।

ভিতরে সামান্য কিছু বাতাস রয়ে গেলেও হাতল ধরে টানলে বাটি বড় হয়, ফলে ভিতরের বাতাস আয়তনে প্রসারিত হয় আর তার চাপ কমে যায়। কাজেই বাইরের বাতাসের চাপে তারা আটকে থাকে।

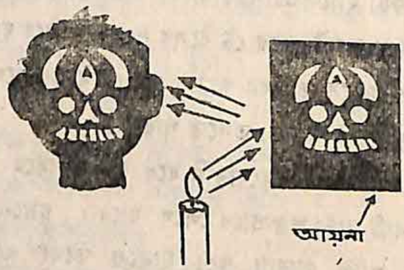
৬৪। ভূত। ভূত!

প্রয়োজন ঃ একটা আয়না, একটা টেবিল ল্যাম্প বা মোমবাতি, কাল কাগজ, কাঁচি এবং তোমার একজন বন্ধু।

পদ্ধতি ঃ কাল কাগজে একটা ভূত বা রাক্ষসের ছবি আঁক। তিনটে চোখ (একটা কপালে), দাঁত, নাক, শিং—এইসব ভূতের মত বিকট করে কর। ব্লেডের সাহায্যে চোখ, দাঁত ও নাকের জায়গাগুলো কেটে বাদ দিয়ে ছবিটা আয়নার উপর আঠা দিয়ে সাঁট।

এবার ঘর অন্ধকার করে শুধু একটা টেবিল ল্যাম্প বা মোমবাতি জ্বাল।

আয়না এমন জায়গায় বসাও যাতে বাতির আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে দেওয়ালে যে-স্থানে তোমার বন্ধুর মাথার ছায়া গিয়ে পড়েছে, ঠিক সেই,



চিত্র 55 (পরীক্ষা 64)

ছায়ার উপর পড়ে। তাহলেই দেওয়ালে একটা ভূত বা রাক্ষসের মত বিকট মূর্তি দেখা যাবে (চিত্র ৫৫)।

দুটো আয়না ব্যবহার করলে ছবিটা আরও ভয়ঙ্কর লাগবে। একটা আয়নার কাগজে থাকবে ভূতের দাঁত ও নাকের ছবি আর একটা আয়নার কাগজে থাকবে ভূতের চোখের ছবি। আয়না দুটো এমনভাবে বসাও যাতে উভয় আয়নার প্রতিফলিত আলো তোমার বন্ধুর মাথার ছায়ার উপর পড়ে। আয়নাদুটো একটু একটু নাড়াচাড়া করলে ভূতের ছবি আরও বিকট লাগবে।

আয়নাকে ঠিকভাবে বসানোর উপরই এই খেলার মজা নির্ভর করে। এই বিষয়ে মনে রাখবে আপতিত রশ্মি ও আয়নার মাঝখানের কোণ প্রতিফলিত রশ্মি ও আয়নার মাঝখানের কোণের সমান।

৬৫। চৌম্বক নাচ।

প্রয়োজন : একটি শক্তিশালী চুম্বক, তার, কার্ডবোর্ড ও কাগজ।

পদ্ধতি : কার্ডবোর্ড কেটে একটি আয়তাকার অংশ বাদ দাও যেন একটি ফাঁকা আয়তের চারিদিকে কার্ডবোর্ড থাকে। কার্ডবোর্ডের ফাঁকা অংশের নীচের দিকে একটা তার লাগাও। কার্ডবোর্ডের মাথায় একটি চুম্বক বসাবার ব্যবস্থা কর।

এবার কাগজ কেটে দুটো মানুষের মূর্তি বানাও। মূর্তি দুটোর পেছন দিকে

দুটো লম্বা সূচ দৈর্ঘ্য বরাবর কাগজ আর আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও। এখন মূর্তি দুটোকে তারের উপর দাঁড় করিয়ে দিলে চুম্বকের আকর্ষণের ফলে তারা তারের



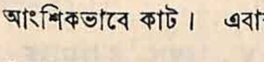
চিত্র 56 (পরীক্ষা 65)

উপর দাঁড়িয়ে থাকবে, পড়ে যাবে না। এবার তার সামান্য একটু নাড়িয়ে দিলে মূর্তিদুটো তারের উপর নাচ শুরু করে দেবে (চিত্র ৫৬)!

৬৬। ক টুকরো হবে ?

প্রয়োজন ঃ একটি লম্বা কাগজ।

পদ্ধতি ঃ লম্বা কাগজটার দুধার থেকে সমান দুরত্বে দুজায়গায় কাঁচি দিয়ে আংশিকভাবে কাট। এবার সবাইকে জিজ্ঞেস কর কাগজের দুপ্রান্ত ধরে দুদিকে টানলে কাগজ ক টুকরো হবে ? সবাই বলবে তিন টুকরো (চিত্র ৫৭)।



চিত্র 57(পরীক্ষা 66)

এখন কাউকে কাগজটা ওভাবে টানতে বল। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখবে কাগজটা তিন টুকরো না হয়ে হল মাত্র দু' টুকরো!

ব্যাখ্যা ঃ তুমি যতবারই এটা করনা এবং যত সমানভাবেই দু'জায়গায় কাট না, সব সময়ই কাগজটা দু' টুকরো হবে।

এর কারণ হল দু'টো কাটাকে সমান করার জন্য তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন, কাটা দু'টো কখনও একেবারে সমান হবে না, এক জায়গায় বেশী কাটা আর এক জায়গায় কম কাটা হবে। চোখে দেখে সমান মনে হলেও কমবেশী হবেই। আর যে জায়গায় কাটাটা বেশী সেজায়গাটা বেশী দুর্বল, ফলে সেখানেই কাগজটা ছিড়তে শু'রু করে।

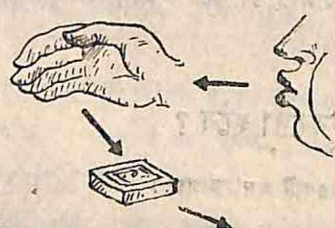
আর একবার ছিঁড়তে শুরু করলে কাটাটা বাড়তে থাকবে, ফলে সেই জায়গাটা আরো দুর্বল হবে, কাজেই ছেঁড়াটা শেষ পর্যন্ত চলবে। সুতরাং কাগজটা শুধু এক জায়গাতেই ছিঁড়বে। অর্থাৎ মাত্র দুটুকরো হবে। এই জন্যই বলা হয় একটা শেকলের সবচেয়ে দুর্বল অংশ যতটা শক্ত শেকলটাও ততটাই শক্ত।

৬৭। ফুঁ দিয়ে কাছে আনা!

প্রয়োজন: একটি দেশলাই বাক্স।

পদ্ধতি: টেবিলের উপর একটি খালি দেশলাই বাক্স আছে। এটাকে ফুঁ দিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু ফুঁ দিয়ে কি কাছে আনা যায়?

কৌশল: তোমার হাতটা বাক্সের পিছনে রেখে এমনভাবে ফুঁ দাও যাতে



চিত্র ৫৪(পরীক্ষা 67)

তোমার মুখের বাতাস হাতে প্রতিফলিত হয়ে বাক্সটাকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। দেখবে বাক্সটা তোমার কাছে চলে এসেছে (চিত্র ৫৮)।

এই পরীক্ষার সময় লক্ষ্য রাখবে যেন টেবিলটা মসৃণ হয় এবং কোন টেবিলক্লথ না থাকে।

৬৮। বোতলে কর্ক ঢোকানো!

প্রয়োজন: একটা বোতল আর এমন একটা কর্ক যা বোতলের মুখের চেয়ে সামান্য ছোট।

পদ্ধতি: সকলকে ফুঁ দিয়ে কর্কটা বোতলের ভিতরে ঢোকাতে বল। কিন্তু শত শত চেষ্টা করেও কেউ তা পারবে না। তখন তুমি বোতলের মুখ থেকে বাতাস শুষে নাও. দেখবে কর্কটা বোতলের ভিতরে ঢুকে গেছে।

ব্যাখ্যাঃ বোতলের মুখে ফুঁ দিলে কিছু বাতাস কর্ক ও বোতলের মুখের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে বোতলের ভিতর ঢোকে। ফলে বোতলের ভিতরের বাতাসের চাপ বেড়ে যায়, কাজেই কর্কটা তো বোতলের ভেতরে ঢোকেই না, উপরন্তু বাইরে বেরিয়ে আসে।

অপরপক্ষে বোতল থেকে বাতাস শুষে নিলে, বোতলের ভিতরের বাতাসের চাপ কমে যায়, ফলে বাইরের বাতাসের চাপে কর্কটা বোতলের ভিতর ঢুকে যায়।

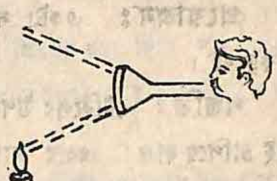
৬৯। ফানেলে ফুঁ দিয়ে বাতি নেভানো।

প্রয়োজনঃ একটি মোমবাতি একটি ফানেল।

পদ্ধতিঃ মোমবাতি জ্বালিয়ে সবাইকে বল ফানেলের সরু মুখে ফুঁ দিয়ে বাতিটা নেভাতে।

কিন্তু এভাবে ফুঁ দিয়ে কেউ বাতিটা নেভাতে পারবে না। তখন সকলে ফানেলটাকে বাতির কাছে এনে ফুঁ দেবে কিন্তু তাতে বাতিটা তো নিভবেই না, উপরন্তু বাতির শিখাটা ফানেলের দিকে বেঁকে যাবে।

এখন তুমি ফানেলটা এমনভাবে ধর যাতে বাতির শিখাটা ফানেলের অক্ষ বা মধ্যরেখা বরাবর না থেকে ধার বরাবর থাকে। এবার ফুঁ দিলেই বাতি নিভে যাবে (চিত্র ৫৯)।



চিত্র 59 (পরীক্ষা 69)

ব্যাখ্যাঃ অন্যরা ফুঁ দেওয়ার সময় বাতির শিখা ছিল ফানেলের অক্ষ বরাবর। এখন ফানেলের সরু মুখে ফুঁ দিলে বাতাস ফানেলের অক্ষ বরাবর না বার হয়ে বেরোয় ধার বরাবর। ফলে অক্ষ বরাবর বাতাসের চাপ কমে যায়, আর বাইরের বাতাসের চাপে শিখা ফানেলের দিকে বেঁকে যায়।

অন্য পক্ষে বাতির শিখা ফানেলের ধার বরাবর থাকলে ফুঁ দিলে বাতাস সোজাসুজি শিখাকে আঘাত করে এবং শিখা নিভে যায়।

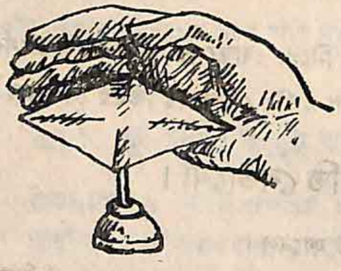
৭০। কাগজ কেন ঘুরছে ?

প্রয়োজনঃ একটা পাতলা কাগজ ও একটা পিন।

পদ্ধতিঃ পাতলা কাগজ কেটে একটা ছোট বর্গক্ষেত্র বার কর। এর

মধ্যবিন্দুতে একটা খাড়া পিনের উপর কাগজের বর্গটা বসিয়ে দাও। এবার সবাইকে বল ফুঁ না দিয়ে বা কোনভাবে স্পর্শ না করে কাগজের বর্গটা ঘোরাতে।

কৌশল : তোমার হাতটা ধীরে ধীরে কাগজের কাছে নিয়ে এস। দেখবে বর্গটা ঘুরতে শুরু করেছে—প্রথমে আস্তে, পরে জোরে। হাতটা সরিয়ে নিলে ঘুর্ণন বন্ধ হয়ে যাবে আবার কাছে আনলেই শুরু হবে (চিত্র ৬০)।



চিত্র ৬০ (পরীক্ষা 70)

ব্যাখ্যা : হাতের সংস্পর্শে এসে নীচের বায়ু গরম হয়ে উপরে ওঠে। আর এই বাতাসের ধাক্কাতেই কাগজটা ঘুরতে থাকে। 'কাগজ কেন ঘুরছে' (৩৮ নম্বর পরীক্ষা) দেখ।

৭১। ফুঁ দিয়ে বই তোলা !

প্রয়োজন : একটা সরু মুখওয়ালা প্লাষ্টিক বা রাবারের ব্যাগ এবং কিছু বই।

পদ্ধতি : টেবিলের উপরে ব্যাগটা রাখ। ব্যাগের উপর কয়েকটা ভারী বই চাপিয়ে দাও। এবার ব্যাগের সরু মুখে জোরে ফুঁ দিতে থাক। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখবে, কি মজা, ভারী বইগুলো কেমন উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে (চিত্র ৬১)।



চিত্র ৬১ (পরীক্ষা 71)

ব্যাখ্যা : ফুঁ দিলে ব্যাগের ভেতর কিছু বাতাস ঢোকে। এই বাতাসের চাপ বাইরের বাতাসের চাপের চেয়ে বেশী হওয়ায় ব্যাগটা ফুলে যায়। বাইরের

বাতাসের চাপ স্বাভাবিক অবস্থায় মোটামুটি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে এক কিলোগ্রাম।

মনে কর, বইগুলোর ওজন দশ কিলোগ্রাম এবং সবচেয়ে নীচের বইয়ের তলায় ক্ষেত্রফল দু'শ বর্গ সেন্টিমিটার। তাহলে বইগুলোকে উপরে তোলবার জন্য চাপ দিতে হবে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে $\frac{১০}{২০০}$ কিলোগ্রাম বা মাত্র ৫০ গ্রাম।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যাগের ভিতরের চাপ যদি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ১ কিলোগ্রাম +৫০ গ্রাম বা ১০৫০ গ্রাম হয় অর্থাৎ বাইরের বাতাসের চাপের চেয়ে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ বেশী হয়, তাহলেই ব্যাগটা বইগুলো শুদ্ধ উপরের দিকে ঠেলে উঠবে।

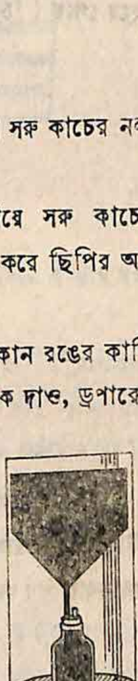
আর ব্যাগের ভিতরের বাতাসের চাপ মাত্র এইটুকু বৃদ্ধি করতে তোমাকে অসাধারণ ফুসফুসের জোরের অধিকারী হতে হবে না!

৭২। জলের তলায় আগ্নেয়গিরি!

প্রয়োজনঃ একটি ছোট শিশি ও তার ছিপি. একটা সরু কাচের নল, একটা ড্রপার ও একটি বড় কাচের পাত্র।

পদ্ধতিঃ ছিপিতে দুটো ছিদ্র করে একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সরু কাচের নলটা ঢুকিয়ে দাও। ড্রপার থেকে ছুঁচালো কাচের নলটা বার করে ছিপির অন্য ছিদ্র দিয়ে ঢোকাও।

শিশিতে গরম জল ভর্তি করে তাতে কয়েক ফোঁটা যে-কোন রঙের কালি ঢেলে মিশিয়ে নাও। ছিপিটা শিশির মুখে ভাল করে আটকে দাও, ড্রপারের ছুঁচলো মুখ উপরের দিকে থাকবে অন্য নলের নীচের মুখ শিশির তলা পর্যন্ত চলে যাবে। এবার বড় কাচের পাত্রে শিশিটা বসিয়ে পাত্রটা ঠাণ্ডা জলে পূর্ণ কর।


চিত্র 62 (পরীক্ষা 72)

এখন একটা সুন্দর জিনিষ দেখতে পাবে। রঙীন কালির প্রবাহ ফানেলের আকারে ড্রপারের সরু মুখ দিয়ে ক্রমাগতঃ আগ্নেয়গিরির মত উপরে উঠছে (চিত্র ৬২)!

ব্যাখ্যাঃ পরিচলন স্রোতের জন্যই এরকম হয়। গরম জল ঠাণ্ডা জলের চেয়ে হালকা, তাই ছুঁচলো নল দিয়ে গরম রঙীন জল উপরে ওঠে আর অন্য নল দিয়ে ঠাণ্ডা ভারী জল

শিশিতে ঢোকে। 'নীচের জল কি উপরে উঠতে পারে' (২৮ নম্বর পরীক্ষা) দেখ।

শিশির গরম জলকে পাত্রের ঠাণ্ডা জল সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত এই রঙীন স্রোত চলতে থাকে।

৭৩। বোতলের মধ্যে আম !

প্রয়োজন : একটা বড় বোতল আর আমগাছ।

পদ্ধতি : সরু মুখওয়ালা একটা বড় বোতলের মধ্যে একটা খুব ছোট আমশুদ্ধ আমগাছের একটা সরু ডাল ঢুকিয়ে দাও। এবার বোতলটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখ।

ধৈর্য ধরে কিছুদিন অপেক্ষা করলে দেখবে—বোতলের ভিতর আমটা অনেক বড় হয়ে গেছে (চিত্র ৬৩)।



চিত্র 63 (পরীক্ষা 73)

এবার বোতলের মুখ বরাবর ডালটা কেটে ফেলে বোতলের বাঁধন খুলে ফেল। একটা সরু মুখওয়ালা বোতলের মধ্যে এত বড় একটা আম কি করে প্রবেশ করল ভেবে সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে!

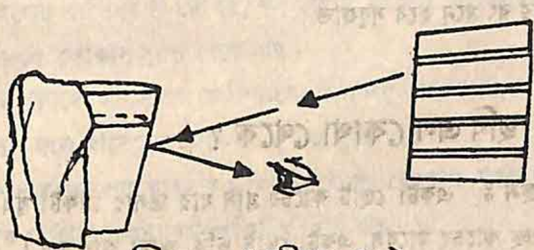
৭৪। লাল না সবুজ !

প্রয়োজন : একটা কাচের গ্লাস, একটু মার্কিউরোক্রোম ও জল। মার্কিউরোক্রোম ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়।

পদ্ধতি ঃ আধ গ্লাস জলের মধ্যে কিছু মার্কিউরোক্রোম দ্রবণ মেশাও। এবার গ্লাসটা ঘরের ভেতর খোলা জানলার সামনে এমনভাবে ধর যাতে তোমার সামনে থেকে আলো এসে গ্লাসের দ্রবণের মধ্যে দিয়ে সংবাহিত হয়ে তোমার চোখে পৌছয়। দেখবে দ্রবণের রং লাল।

এখন ঘরের ভেতর গ্লাসটা একটু নীচে নামিয়ে গ্লাসের তলা ও চারপাশে ভাল করে কাপড় জড়িয়ে উপর থেকে গ্লাসের দিকে তাকাও। আশ্চর্য হয়ে দেখবে দ্রবণের রং সবুজ!

অথবা যদি গ্লাসটা ঘরের ভেতর জানলার বিপরীত দিকে এমনভাবে ধর যাতে তোমার পেছন থেকে জানলা দিয়ে আলো এসে গ্লাসে পড়ে, তা হলেও



চিত্র 64 (পরীক্ষা 74)

দেখবে দ্রবণের রং সবুজ! [গ্লাসের বিপরীত দিক কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ধরতে হবে] (চিত্র ৬৪)।

ব্যাখ্যা ঃ মার্কিউরোক্রোম দ্রবণ দু'রকম আলো সংবাহিত (Transmit) করে; একটি হল নীল সবুজ আলোর পটি বা ব্যাণ্ড, অপরটি হল লাল রঙের পটি। নীল সবুজ পটি লাল পটির চেয়ে বেশী চওড়া; লাল পটির মধ্যে কিছু ইনফ্রারেড আলোও থাকে, কিন্তু এটা মানুষের চোখে ধরা পড়ে না; এটা সহ অবশ্য লাল পটিও চওড়া। অন্য রংগুলি মার্কিউরোক্রোম দ্রবণ দ্বারা শোষিত হয়ে যায়।

এই দুই পটির মধ্যে আবার লাল পটি অনেক কম শোষিত ও বেশী সংবাহিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে জানলা দিয়ে আসা আলো দ্রবণের একটা পুরু স্তরের মধ্য দিয়ে সংবাহিত হয়ে তোমার চোখে পৌছয়। পুরু স্তরের মধ্য দিয়ে সংবাহিত হওয়ায় নীল সবুজ পটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে শোষিত হয়, কিন্তু লাল পটি খুব কম শোষিত হয়। ফলে তোমার চোখে পৌছানো আলোর মধ্যে নীল সবুজ রং

খুব কম থাকে আর লাল রং খুব বেশী থাকে আর তুমিও দ্রবণকে লাল দেখ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু সংবাহিত আলোর সাহায্যে দ্রবণকে দেখছ না, দেখছ প্রতিফলিত আলোর দ্বারা। এই ক্ষেত্রে নীল সবুজ বা লাল কোন পটিই বিশেষ শোষিত হয় না, ফলে তোমার চোখে নীল, সবুজ ও লাল— তিন রংই এসে পৌছয়।

এখন লালের পরিপূরক বর্ণ হল নীলাভ সবুজ অর্থাৎ লাল ও নীলাভ সবুজ বর্ণ মিলে সাদা আলোর সৃষ্টি করে। আবার লাল পটির চেয়ে নীল সবুজ পটি অনেক বেশী চওড়া বলে লাল রঙের সঙ্গে কিছুটা নীলাভ সবুজ রং মিশে সাদা আলোর সৃষ্টি করেও কিছু নীলাভ সবুজ বর্ণ অবশিষ্ট থেকে যায়। কাজেই দ্রবণের রং মনে হবে সবুজাভ।

৭৫। ছবি এল কোথা থেকে ?

প্রয়োজন ঃ একটা ছোট কাচের গ্লাস যার তলার দিকটা খুব পুরু আর সরু, একটা স্বচ্ছ কাচের মার্বেল, একটা ছোট ছবি, আঠা আর জল।

পদ্ধতি ঃ একটা কাচের গ্লাসের তলায় একটা মার্বেল রয়েছে। এবার গ্লাসে জল ঢাললেই গ্লাসের নীচে একটা বড় ছবি ফুটে উঠলো! সবাই অবাক!

কৌশল ঃ আগে থেকেই গ্লাসের নীচে উল্টোদিকে একটা ছোট ছবি আঠা দিয়ে আটকে রাখবে। ছবির মুখ যেন গ্লাসের উপরের দিকে থাকে। এখন একটা মার্বেল গ্লাসের ভেতর ফেলে দিলে, উপর থেকে ছবি আর দেখা যাবে না। মার্বেলটা এমন মাপমত হবে যাতে গ্লাসের তলায় ফেলে দিলে গ্লাসের গায়ের সাথে আটকে থাকে। এখন গ্লাসে জল ঢাললেই ছবিটা দেখা যাবে (চিত্র ৬৫)।



চিত্র 65 (পরীক্ষা 75)

ব্যাখ্যা ঃ মার্বেলটা একটা উভোত্তল লেন্সের মত কাজ করে। আমরা জানি, কোন উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে কোন বস্তু থাকলে, বিপরীত দিক থেকে তাকালে তার একটা বড় প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কিন্তু এখানে

মার্বেলের ফোকাস দূরত্ব এত কম আর গ্লাসের তলা এত পুরু যে, ছবিটা থাকে ফোকাস দূরত্বের বাইরে। ফলে ছবির কোন প্রতিবিম্ব দেখা যায় না।

এখন গ্লাসে জল ঢাললে মার্বেলের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যায়। কোন লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নির্ভর করে পারিপার্শ্বিকের উপর। পারিপার্শ্বিক লঘু মাধ্যম হলে ফোকাস দূরত্ব যত হয়, ঘন মাধ্যম হলে তার চেয়ে বেশী হয়। কারণ লেন্সের সূত্র থেকে আমরা পাই

$$\frac{1}{f}=(\mu-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$$

যখন f = ফোকাস দুরত্ব, μ = লেন্সের প্রতিসরাঙ্ক এবং r_1 ও r_2 যথাক্রমে লেন্সের প্রথম ও দ্বিতীয় তলের বক্রতা ব্যাসার্ধ। আবার চারপাশে লঘু মাধ্যম থাকলে লেন্সের প্রতিসরাঙ্ক যত হয়, ঘন মাধ্যম থাকলে প্রতিসরাঙ্ক তার চেয়ে কম হয় ; ফলে ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যায়।

এখানে প্রথমে মার্বেলের চারিপাশে ছিল লঘু মাধ্যম বায়ু, পরে ছিল ঘন মাধ্যম জল ; ফলে মার্বেলের ফোকাস দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।

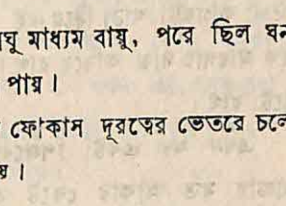
ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় ছবিটা মার্বেলের ফোকাস দূরত্বের ভেতরে চলে আসে, আর ছবিটার একটা বড় প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

৭৬। ঘরের ভেতর গাছ ?

প্রয়োজন ঃ একটি পিজবোর্ড আর দড়ি।

পদ্ধতি ঃ পিজবোর্ডটা আয়তাকারে কেটে দাও। এর এক পিঠে একটা ঘর আর অন্য পিঠে একটা গাছের ছবি আঁক। পিজবোর্ডটার দুধারে দুটো ছিদ্র করে তার ভিতর দিয়ে একটা দড়ি পরিয়ে দাও।

এবার দু'হাতের আঙুল দিয়ে দড়ির দু'প্রান্ত চেপে ধর। দড়িতে মোচড় দিয়ে পিজবোর্ডটাকে জোরে ঘোরাতে থাক। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখবে ঘরের ভেতরে যেন একটা গাছ হয়েছে! (চিত্র ৬৬)



চিত্র 66 (পরীক্ষা 76)

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের চোখের সামনে থেকে কোনও দৃশ্য সরিয়ে নেওয়ার পরও $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড পর্যন্ত তার প্রভাব

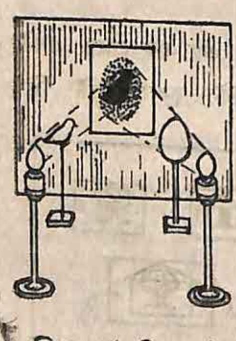
রেটিনাতে থাকে। একে বলে দৃষ্টি নির্বন্ধ (Persistence of vision)। দড়ি জোরে ঘোরালে ঘরের ছবি দেখার $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ডের মধ্যেই আমরা গাছের ছবি দেখি। ফলে রেটিনাতে ঘরের ছবির প্রভাব মিলিয়ে যাওয়ার আগেই গাছের ছবি দেখতে পাই। কাজেই দুটো ছবি আমরা একই সঙ্গে দেখতে পাই, আর মনে হয় যেন ঘরের ভিতরেই রয়েছে গাছটা!

৭৭। ডিমের ভেতর পাখীর বাচ্চা!

প্রয়োজন : একটা পিজবোর্ড, দুটো টেবিল ল্যাম্প, দুটো কাঠ বা লোহার স্ট্যাণ্ড ও তেলা কাগজ।

পদ্ধতি : পিজবোর্ডের মাঝখানে একটা বড় আয়তাকার গর্ত করে নাও। তেলা কাগজটা আঠা দিয়ে এই গর্তের উপর লাগিয়ে দাও। এই পিজবোর্ডটা এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখ। পিজবোর্ডের সামনে দু'পাশে টেবিল ল্যাম্প দুটো রাখ।

এখন অন্য একটা পিজবোর্ড থেকে একটা ডিমের মত আর একটা পাখীর বাচ্চার মত আকার কেটে বার কর। একটা স্ট্যাণ্ডের উপর ডিম ও অন্য স্ট্যাণ্ডের উপর পাখীর বাচ্চা বসাও। পিজবোর্ড ও ডানদিকের টেবিল ল্যাম্পের মাঝে ডিম বসানো স্ট্যাণ্ড এবং পিজবোর্ড ও বাঁদিকের টেবিল ল্যাম্পের মাঝখানে পাখীর বাচ্চা বসানো স্ট্যাণ্ড দাঁড় করাও। সামনেটা পর্দা দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দাও যাতে পিজবোর্ডের তেলা কাগজটা ছাড়া আর কিছু না দেখা যায়।



চিত্র 67 (পরীক্ষা 77)

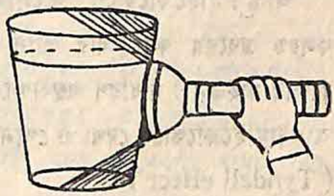
এবার ডান দিকের টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিলে সবাই তেলা কাগজের উপর ডিমের ছায়া দেখতে পাবে। এরপর বাঁ দিকের আলো জেলে দিলে ডিমের ছায়ার উপর পাখীর বাচ্চার ছায়া দেখা যাবে। মনে হবে যেন ডিমের ভেতর পাখীর বাচ্চা তৈরি হচ্ছে। সবাইকে বল, তুমি এক্সরের সাহায্যে ডিমের ভেতরের পাখীর বাচ্চার ফটো দেখাচ্ছ (চিত্র ৬৭)!

টেবিল ল্যাম্প দুটো ও স্ট্যাণ্ড দুটো এমনভাবে বসাতে হবে—যাতে তেলা কাগজের উপর ডিমের ছায়ার ভেতর পাখীর বাচ্চার ছায়াটা পড়ে।

৭৮। আলোর খেলা !

প্রয়োজন ঃ এক গ্লাস জল, অল্প একটু দুধ ও একটি টর্চ।

পদ্ধতি ঃ এক গ্লাস জলে কয়েক ফোঁটা দুধ দিয়ে ভাল করে মেশাও। গ্লাসটাকে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে গ্লাসের উপর টর্চের আলো ফেল। এখন আলোকরশ্মির সমকোণে গ্লাসের দিকে তাকাও। গ্লাসের জল মেশানো দুধকে কিন্তু আর সাদা দেখাবে না, দেখাবে নীলচে (চিত্র ৬৮)।



চিত্র ৬৭ (পরীক্ষা ৭৪)

ব্যাখ্যা ঃ আলোকের বিক্ষেপণের জন্যই এরকম হচ্ছে।

বিক্ষেপণ (Scattering) কাকে বলে ? তোমরা জান আলোককে তরঙ্গ-রূপে কল্পনা করা যায়। যখন কোন আলোক-তরঙ্গ অত্যন্ত ক্ষুদ্র কোন বস্তুকণার (যেমন জলে ভাসমান দুধের কণা) উপর পতিত হয়, তখন এই বস্তুকণাগুলি আলোক তরঙ্গের আঘাতে শক্তি লাভ করে উদ্দীপ্ত হয় এবং নিজেরাই আলোক তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। একেই বলে বিক্ষেপণ।

বিক্ষেপণ দুরকম ; সাধারণ ক্ষেত্রে আপতিত রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও বিক্ষিপ্ত রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য একই থাকে। একে বলে কোহারেন্ট (Coherent) বিক্ষেপণ। বিজ্ঞানী র‍্যালে (Rayleigh) এ-নিয়ে অনেক গবেষণা করেন বলে একে র‍্যালে বিক্ষেপণও বলে।

আর বিশেষ ক্ষেত্রে আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও বিক্ষিপ্ত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অসমান হয় ; এ হল ইনকোহারেন্ট বিক্ষেপণ। এর উদাহরণ হল বিজ্ঞানী রামন আবিষ্কৃত রামন এফেক্ট।

র‍্যালে বিক্ষেপণের বেলা আপতিত রশ্মির প্রাবল্য (intensity) এক থাকলে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম হয়, বিক্ষিপ্ত রশ্মির প্রাবল্য তত বেশী হয়। এর কারণ হল বেশী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর যত অংশ বিক্ষিপ্ত হয়, কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যর আলোর তার চেয়ে অনেক বেশী অংশ বিক্ষিপ্ত হয়। আপতিত রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ (ল্যামডা) হলে বিক্ষিপ্ত রশ্মির প্রাবল্য $\frac{1}{\lambda^4}$ এর সমানুপাতী হয়।

লাল ও নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত 1·8; সুতরাং আপতিত আলোয় নীল ও লাল বর্ণের প্রাবল্য সমান থাকলে বিক্ষিপ্ত নীল আলোর প্রাবল্য লাল

আলোর প্রাবল্যের $(1{\cdot}8)^4$ বা প্রায় দশ গুণ হবে। তাহলে সাদা আলো বিক্ষিপ্ত হলে বিক্ষেপণের পর তার বর্ণ নীল মনে হবে।

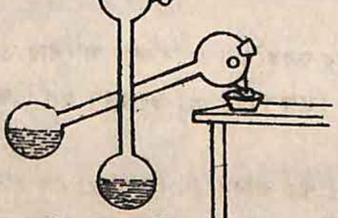
এখানে টর্চের সাদা আলো জলের মধ্যে ভাসমান দুধের কণাদ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়, ফলে বিক্ষিপ্ত আলোকে নীল মনে হয়।

আল্ট্রা মাইক্রোস্কোপে আলোর এই বিক্ষেপণ কাজে লাগানো হয়। যে-সব কলয়ড দ্রবণের কণা (যার ব্যাস 0 2 মাইক্রনের কম, এক সেন্টিমিটার = এক হাজার মাইক্রন) সাধারণ অনুবীক্ষণে দেখা যায় না, তাও বিক্ষিপ্ত আলোর দ্বারা আলট্রামাইক্রোস্কোপে দেখা ও গোনা যায়। এই ঘটনাকে বলে **'টিনডাল এফেক্ট'** (Tyndall effect)।

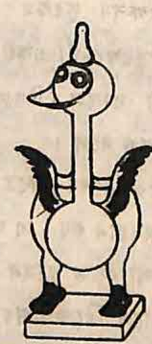
৭৯। জল খাওয়া পাখী !

প্রয়োজন ঃ একটা কাচের খেলনা, পাখী ও ইথার।

এই পাখীর মাথা একটি ছোট কাচের গোলক, গলা একটি কাচের নল এবং পেট একটি বড় কাচের গোলক। এই খেলনা পাখী কাচের কারখানা থেকে



চিত্র ৬৯ (পরীক্ষা ৭৯)



চিত্র ৬৯ (পরীক্ষা ৭৯)

তৈরি করে নাও (চিত্র ৬৯)। মাথার গোলকে একটি ছিদ্র থাকবে যা ছিপি দিয়ে বন্ধ করা যায়, পাখীর গলায় কাচের নল এমনভাবে একটা স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে আটকাও, যাতে পাখীটা দুলতে বা ওঠানামা করতে পারে।

তুলো দিয়ে পাখীর চোখ ও মাথার ঝুঁটি তৈরি করে নিতে পার। মাথার গোলকে একটা কাচের ঠোঁট আটকে দিয়ে তাতেও তুলো লাগিয়ে নাও।

পদ্ধতিঃ পাখীর মাথার ছিদ্র দিয়ে কিছু ইথার ভেতরে ঢুকিয়ে দাও। ইথার যেন নীচের গোলককে আংশিক ভর্তি করে। এরপর ছিপি বন্ধ কর।

পাখীর সামনে একটা পাত্রে কিছু জল রাখবে। এখন দেখা যাবে পাখীটা নীচে ঝুঁকে পড়ে সামনের পাত্রের জলে তার ঠোঁট ডুবিয়ে দিচ্ছে, যেন জল খাচ্ছে আবার একটু পর সোজা হয়ে উঠছে। পাখীর মাথা ক্রমাগতঃ এরকম ওঠানামা করতে থাকে।

ব্যাখ্যাঃ পাখীর ভেতর এতটা পরিমাণ ইথার দিতে হবে যাতে পাখীর নীচের অংশ উপরের তুলনায় খুব সামান্য ভারী হয়। এতে পাখীটা মাথা উঁচু করে খাড়া হয়ে থাকে। ইথার অত্যন্ত উদ্বায়ী বলে অল্পক্ষণের মধ্যে কিছু ইথার বাষ্পীভূত হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে পাখীর নীচের অংশের ইথার কমে যাওয়াতে নীচের অংশ উপরের অংশের চেয়ে হালকা হয়ে পড়ে।

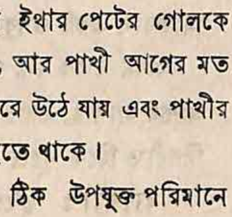
ফলে পাখীর মাথা ভারী হয়ে নীচে নেমে আসে এবং ঠোঁটের তুলো জলে ভিজে যায়। জলে ভেজায় পাখীর মাথা ঠাণ্ডা হয় এবং ভিতরের কিছু ইথার বাষ্প জমে গিয়ে তরল ইথারে পরিণত হয়। এই তরল ইথার পেটের গোলকে চলে আসায় পাখীর নীচের অংশ আবার ভারী হয়ে পড়ে, আর পাখী আগের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। আবার ইথার বাষ্পীভূত হয়ে উপরে উঠে যায় এবং পাখীর মাথা ভারী হয়ে নীচে হেলে পড়ে। এরকম ক্রমাগতঃ হতে থাকে।

তুটো ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবে, পাখীর ভেতরে যেন ঠিক উপযুক্ত পরিমানে ইথার রাখা হয় এবং জল যেন যথেষ্ট ঠাণ্ডা থাকে।

৮০। হাত থেকে বিদ্যুৎ ফুলিঙ্গ!

প্রয়োজনঃ একটি খবরের কাগজ, একটি ব্রাস ও হিটার বা স্টোভ।

পদ্ধতিঃ তোমার দু'হাত, খবরের কাগজ ও ব্রাস হিটারের সাহায্যে যথা-সম্ভব গরম কর। খবরের কাগজটা ব্রাসের দ্বারা ভালভাবে ঘর্ষণ কর। এবার তোমার হাতের আঙ্গুলগুলো খবরের কাগজের সামনে নিয়ে এলে অবাক হয়ে দেখবে আঙ্গুল থেকে নীলাভ তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ কাগজের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে ভয় পেয়ে যেওনা, ভয়ের কিছু নেই। তবে অন্ধকার ঘরেই এটা দেখা যাবে। (চিত্র ৭০)



চিত্র 70 (পরীক্ষা ৪০)

ব্যাখ্যাঃ কাগজকে ব্রাস দিয়ে ঘষলে কাগজে ধন-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

বাতাসের মধ্যে দিয়ে এই বিদ্যুৎ যাওয়ার ফলে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়। এই পরীক্ষাটা শীতকালে করবে, অন্য সময়ে ভাল হবে না।

৮১। মজার দোলক।

প্রয়োজন ঃ একটি কালো চশমা (গগল্‌স্) ও একটি দোলক।

একটি ছোট চাকতি ফুটো করে তাতে একটা তিরিশ চল্লিশ সেন্টিমিটার লম্বা সুতো বেঁধে দিলেই দোলক তৈরি হবে।

পদ্ধতি ঃ সুতোর প্রান্ত ধরে দোলকটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দোলাও। দোলক যেন একই সমতলে দোলে অর্থাৎ চাকতি যেন একই বৃত্তচাপে বারবার চলাচল করে।

তোমার কোন বন্ধুকে দুই-তিন মিটার দূরে দাঁড়িয়ে বাঁ-চোখে কালো চশমার কাচ লাগিয়ে দোলকটা দেখতে বল। তার মনে হবে চাকতি যেন মাটির সঙ্গে সমান্তরাল একটি উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে।

এখন তাকে বল, ডান চোখে কাচ লাগিয়ে দোলকটার দিকে তাকাতে। আশ্চর্য ব্যাপার, এবার তার মনে হবে চাকতিটা যেন উপ-বৃত্তাকায় পথে আগের বিপরীত দিকে ঘুরছে।

ব্যাখ্যা ঃ দু'চোখে দেখার মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্য এরকম ঘটে থাকে। যে কোন রঙিন কাচ দিয়ে দেখলেও এরকম মনে হবে।

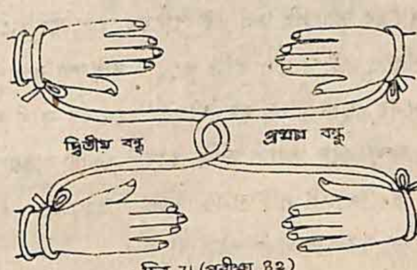
৮২। কি করে হাত ছাড়াবে ?

প্রয়োজন ঃ তোমার দু'জন বন্ধু আর দুটো দড়ি।

পদ্ধতি ঃ তোমার দুই বন্ধুর হাতে ৭১ নম্বর চিত্রের মত দড়ি বেঁধে দাও। এবার তাদের বল দড়ি না খুলে, বা না কেটে দড়ির শিকল ছাড়াতে।

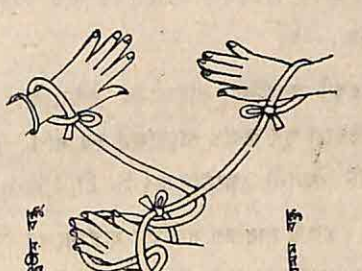
কৌশল ঃ যে-কোন এক বন্ধুর (মনে কর দ্বিতীয় বন্ধুর) যে-কোন এক হাত (মনে কর ডান হাত) প্রথম বন্ধুর বিপরীত হাত অর্থাৎ বাঁ-হাতের ওধারে নিয়ে যাও। এবার দ্বিতীয় বন্ধুর ডান হাতে বাঁধা দড়ি প্রথম বন্ধুর বাঁ হাতের কব্জিতে বাঁধা দড়ির রিং-এর ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দ্বিতীয় বন্ধুর দিকে নিয়ে এস। (চিত্র ৭২) এতে দ্বিতীয় বন্ধুর ডান হাতে বাঁধা দড়ি একটি ফাঁস (loop)

সৃষ্টি করবে। একটা জিনিস মনে রাখবে। যদি দ্বিতীয় বন্ধুর ডান হাতে বাঁধা দড়ি প্রথম বন্ধুর হাতে-বাঁধা দড়ির উপর দিয়ে আসে (৭১ নম্বর চিত্রে যেমন



চিত্র 71 (পরীক্ষা 82)

দেখানো আছে), তবে এই দড়ি যখন প্রথম বন্ধুর বাঁ-হাতে বাঁধা দড়ির রিং-এর ভিতর দিয়ে ঢুকবে তখন দ্বিতীয় বন্ধুর ডান হাতে বাঁধা দড়ির অংশ উপরে থাকবে (চিত্র ৭২)।



চিত্র 72 (পরীক্ষা 82)

এবার দ্বিতীয় বন্ধুর ডান হাতে বাঁধা দড়ি যে ফাঁস সৃষ্টি করেছে, তার ভিতর দিয়ে প্রথম বন্ধুর বাঁ-হাত গলিয়ে দিয়ে, দ্বিতীয় বন্ধুর দু'হাত দু'দিকে টানলেই দুজনের হাতের দড়ির শিকল আলদা হয়ে যাবে। কৌশলটা একবার শিখে গেলে দুই বন্ধু তোমার সাহায্য ছাড়া নিজেরাই নিজেদের হাত ছাড়াতে পারবে।

৮৩। স্বয়ংক্রিয় সাইকন।

তোমরা নিশ্চয়ই সাইকনের কথা শুনেছ। এটা একটা বাঁকানো নল—যার এক বাহু অন্য বাহুর চেয়ে বড়। যদি দুটো পাত্রে কিছু পরিমাণ যে-কোন তরল

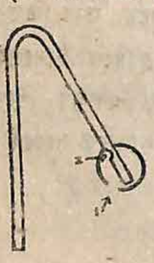
থাকে এবং একটি পাত্রের তরলের তল অন্যটির তরলের তলের চেয়ে উঁচু হয় (যে পাত্রে তরলের তল নীচে, সেই পাত্রে কোন তরল না থাকলেও ক্ষতি নেই, শুধু দেখতে হবে অন্য পাত্রের তরলের তল এই পাত্রের তলদেশের চেয়ে যেন উঁচু হয়); তবে সাইফন সম্পূর্ণরূপে এই তরলে ভর্তি করে (সাইফন সম্পূর্ণরূপে এই তরলে ডোবালে বা সাইফনের ছোট বাহুর মুখ আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে বড় বাহুর মুখ দিয়ে তরল ঢাললেই তা সম্পূর্ণরূপে তরলে ভর্তি হবে) ছোট বাহুর মুখ উচ্চতলবিশিষ্ট পাত্রের তরলের নীচে রাখলেই সাইফনের ক্রিয়া শুরু হয় এবং উচ্চতলবিশিষ্ট পাত্র থেকে অন্য পাত্রে তরল চলে আসতে থাকে।

এভাবে সাইফনের সাহায্যে তরলের উচ্চতলবিশিষ্ট পাত্র থেকে নিম্নতলবিশিষ্ট পাত্রে যে-কোন তরল স্থানান্তরিত করা সম্ভব (যতক্ষণ উভয় পাত্রে তরলের তলের পার্থক্য থাকে, ততক্ষণ তরলের স্থানান্তকরণ চলতে থাকে)। কিন্তু এই সাইফনের অসুবিধা হল—প্রতিবার ব্যবহারের পূর্বে সাইফন সম্পূর্ণরূপে তরলে ভর্তি করে নিতে হয়।

এখানে এমন একটি স্বয়ংক্রিয় সাইফনের বর্ণনা করা হল, যার এই অসুবিধা নেই অর্থাৎ যাকে তরলে পূর্ণ করার প্রয়োজন হয় না। এই স্বয়ংক্রিয় সাইফনের আবিষ্কর্তা সোভিয়েট বিজ্ঞানী প্লেটোনভ (S. D. Platonov)।

প্রয়োজন ঃ একটি সাধারণ সাইফন যার নলের ভিতরের ব্যাস তিন-চার মিলিমিটার এবং যার ছোট বাহুর দৈর্ঘ্য পঁচিশ সেন্টিমিটার বা কম, একটি পিং পং বল এবং নল ও বলে ছিদ্র করার ব্যবস্থা।

প্রস্তুতি ঃ সাইফনের ছোট বাহুর মুখ থেকে তিন বা সাড়ে তিন সেন্টিমিটার দূরে নলে একটি ছোট ছিদ্র কর। ছিদ্রের ক্ষেত্রফল আধ থেকে একবর্গ মিলিমিটারের মধ্যে রাখ। পিং পং বলে একটি ছিদ্র করে তার মধ্যে সাইফনের ছোট বাহু ঢুকিয়ে দাও। ছোট বাহুর মুখ বলের ভিতরের গা বা তলকে প্রায় স্পর্শ করবে।



চিত্র 73 (পরীক্ষা 43)

বলের যেখানে ছোটবাহুর মুখ রয়েছে, তার কাছে বলে আর একটি ছিদ্র কর। এই ছিদ্রের ব্যাস প্রায় এক মিলিমিটার হবে। নলের ছিদ্র বলের ভিতরে থাকবে। চিত্র ৭৩-এ বলের ছিদ্র ১ এবং নলের ছিদ্র ২ ; সাইফনের ছোট বাহু যেন বলের ভিতর দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে, ছোট বাহু যেই ছিদ্র

দিয়ে বলে ঢুকবে, সেই ছিদ্র বড় হলে ছোট বাহুর চারপাশের ফাঁক গালা দিয়ে বন্ধ করে দাও।

পদ্ধতি ঃ একটি পাত্রে কিছু জল নিয়ে পাত্রটি একটি টুলের উপর রাখ। এবার সাইফনের ছোট বাহুর কিছু অংশ বল শুদ্ধ দ্রুত জলের ভিতর ডুবিয়ে দাও। দেখবে ছোট বাহু দিয়ে জল এবং বাতাসের বুদবুদ উপরে উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সাইফনের ক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে এবং পাত্রের জল সাইফনের বড় বাহুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকবে।

সাইফন ঠিকমত কাজ না করলে একটু নেড়েচেড়ে দাও, ছোট বাহু যে ছিদ্র দিয়ে বলে প্রবেশ করছে, সেই ছিদ্র ভালভাবে বন্ধ কর এবং বলের ছিদ্র 1-কে একটু বড় কর।

ব্যাখ্যা ঃ বলটাকে জলের মধ্যে ডোবালে এক নম্বর ছিদ্র দিয়ে বলে জল প্রবেশ করে। এই জল সাইফনের ছোট বাহুতে প্রবেশ করে। নলের মধ্যে জল যতটা উপরে ওঠে, বলের মধ্যে জল ততটা উপরে উঠতে পারে না, কারণ নলের বাতাস সহজেই বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু বলের বাতাস নলের দু-নম্বর ছিদ্র খুব ছোট বলে সহজে বেরোতে পারে না। ফলে নলের মধ্যে জল দ্বিতীয় ছিদ্রের কিছু উপরে উঠে যায়।

এই অবস্থায় বলের বাতাস জলের চাপে বুদবুদ আকারে দ্বিতীয় ছিদ্র দিয়ে নলে প্রবেশ করে এবং উপরে উঠতে গিয়ে কিছু জল উপরে ঠেলে তুলে দেয়। সুতরাং ছোট বাহু দিয়ে জল ও বাতাসের বুদবুদ ক্রমাগত উপরে উঠতে থাকে। এইভাবে যখন বলের সব বায়ু বাইরে বেরিয়ে যায়, তখন ছোট বাহুতে বাতাসের চাপ কমে যায়। কারণ ছোট বাহুতে আংশিক বায়ুশূন্যতা সৃষ্টি হয়। ফলে জল ছোট বাহু দিয়ে উপরে উঠতে থাকে এবং এভাবে সাইফনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে জল পৌছালেই সাইফনের ক্রিয়া শুরু হয় ও ক্রমাগত জল বাইরে বেরিয়ে আসে।

৮৪। অবাক ফোয়ারা।

প্রয়োজন ঃ একটি 30 – 40 সেন্টিমিটার লম্বা কাচের নল – যার একটি মুখ ড্রপারের মত ছুঁচালো (নলের ব্যাস প্রায় এক সেন্টিমিটার ও ছুঁচালো মুখের ব্যাস প্রায় এক মিলিমিটার) এবং এক গ্লাস গরম জল (উষ্ণতা প্রায় 90°C)।

পদ্ধতি ঃ গ্লাসের গরম জলে নলের সরু মুখ ডুবিয়ে দাও। নলের এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ জলের নীচে ডোবানো থাকবে। নলের মোটা মুখ আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে নলটা গ্লাস থেকে তুলে ধর।

এখন তাড়াতাড়ি নলটা উল্টে দাও অর্থাৎ সরু মুখ উপরে উঠে যাবে, মোটা মুখ আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করাই থাকবে। সবাই অবাক হয়ে দেখবে নলের সরু মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসে প্রায় এক মিটার উঁচু একটা ফোয়ারা সৃষ্টি করছে।

ব্যাখ্যা ঃ নল যখন সোজা (সরু মুখ নীচে) অবস্থায় থাকে, তখন নলের নীচের দিকে গরম জল থাকা সত্ত্বেও ভিতরের বাতাস বিশেষ গরম হয় না, কারণ কাচ তাপের কুপরিবাহী। নল উল্টালে গরম জলের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে ভিতরের বাতাসও গরম হয়, ফলে এর চাপ বৃদ্ধি পায় এবং আয়তনে প্রসারিত হতে গিয়ে তা কিছু জলকে উপরে ঠেলে তুলে দিয়ে ফোয়ারার সৃষ্টি করে।

এই পরীক্ষাটি দেখাবার আগে নল যথাসম্ভব ঠাণ্ডা করে নিলে ভাল হয়, কারণ জলের উষ্ণতা ও নলের ভিতরের বাতাসের উষ্ণতার পার্থক্য যত বেশী হয়, ফোয়ারার উচ্চতাও তত বেশী হয়।

৮৫। জলস্তম্ভের খেলা!

প্রয়োজন ঃ একটি দশ সেন্টিমিটার লম্বা ও পনরো মিলিমিটার ব্যাসের কাচের নল (দুমুখ খোলা), একটি বেলুন ও এক গ্লাস জল।

প্রস্তুতি ঃ বেলুন থেকে কাটা রাবারের পর্দা দিয়ে নলের একমুখ ভাল করে বেঁধে দাও। (একটি টেস্টটিউবের তলার দিক কেটে বাদ দিয়েও দুমুখ-খোলা নল প্রস্তুত করতে পার)।

পদ্ধতি ঃ একমুখ-বাঁধা নলটা আংশিক জলপূর্ণ করে খোলা মুখ আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে এই মুখ গ্লাসের জলে ডুবিয়ে ধর, আঙ্গুল সরিয়ে নাও, নলের বাঁধা মুখ এখন উপর দিকে আছে। নল এমনভাবে ধর যাতে নলের ভিতরে জলের তল ও বাইরে গ্লাসের জলের তল এক সমতলে থাকে।

এবার রাবারের পর্দায় আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে আঙ্গুল সরিয়ে নাও। দেখবে নলের ভিতর একটি জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়েছে এবং জলস্তম্ভের মাথা রাবারের পর্দা পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে।

ব্যাখ্যা ঃ পর্দায় চাপ দিলে নলের ভিতর জলের তল কিছু নেমে যায়, চাপ সরিয়ে নিলে বাইরের বাতাসের চাপে নলের কিছু জল দ্রুত উপরে উঠতে গিয়ে জলস্তম্ভের সৃষ্টি করে।

৮৬। ভাসমান জলের ফোঁটা!

প্রয়োজন ঃ একটি মসৃণ ইস্ত্রি।

পদ্ধতি ঃ ইস্ত্রিটা খুব গরম (300°—400°C) করে নাও; এখন এটা টেবিলের উপর এমনভাবে রাখ যেন ইস্ত্রির মসৃন তলদেশ উপর দিকে মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকে। এবার একফোটা জল ইস্ত্রির মসৃণ তলদেশের উপরে ফেলে দাও।

দেখবে, জলের ফোটাটা ইস্ত্রিকে স্পর্শ করে আবার লাফিয়ে উপরে উঠে গেল, আবার নীচে নেমে ইস্ত্রির তলদেশ স্পর্শ করল। এভাবে কয়েকবার ফোটাটা ইস্ত্রিকে স্পর্শ করবে, আবার লাফিয়ে উপরে উঠে যাবে। (দুই থেকে পাঁচ মিলিমিটার পর্যন্ত উঠবে)। এরপর জলের ফোটাটা ইস্ত্রির তলদেশের একটু উপরে কিছুক্ষণ ভেসে বেড়াবে, তারপর একসময় বাষ্পীভূত হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ যখন জলের ফোঁটা প্রথম গরম ইস্ত্রির তলদেশে স্পর্শ করে, তখন এর উষ্ণতা প্রায় 25°C। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফোটার নীচের স্তরের জলের তাপমাত্রা 100°C এ পরিণত হয়। ফলে কিছু জল বাষ্পে পরিণত হয়, আর এই বাষ্প ফোটার ভিতরে আবদ্ধ থাকায় ফোটা হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। উপরে উঠবার ফলে আবার ঠাণ্ডা হয়ে ভারী হয় আর নীচে নেমে আসে। কয়েকবার এরকম করার পর যখন ফোটার সমস্ত জলের উষ্ণতা 100°C এ পৌছায়, তখন আর ফোটা নীচে পড়ে না, ইস্ত্রির তলদেশে কিছু উপরে ভেসে থাকে ; কারণ এই অবস্থায় উপরে উঠেও ফোঁটা বিশেষ ঠাণ্ডা হয় না, ফলে ভিতরের বাষ্পের বুদবুদ সঙ্কুচিত হয় না আর ফোঁটাও ভারী হয়ে নীচে নেমে আসে না।

ছোট ফোটাই (যার ব্যাস তিন থেকে পাঁচ মিলিলিটার) এভাবে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকে আর ইস্ত্রি যত গরম থাকে এই খেলাও তত ভাল হয়। ইস্ত্রির তলদেশও মসৃণ হওয়া চাই। এই খেলাতে গরম ইস্ত্রি ও জলের ফোটা সম্বন্ধে সতর্ক থাকবে।

৮৭। ঘূর্ণবাতের মডেল।

তোমরা নিশ্চয়ই ঘূর্ণবাতের কথা ভূগোলে পড়েছ।

ঘূর্ণবাত কেন হয়? পৃথিবীর কোনও অল্পপরিসর স্থানে বায়ুর উষ্ণতা হঠাৎ কোন কারণে অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলে, সেখানের বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়; ফলে সেখানকার বায়ুর চাপ খুব কমে গিয়ে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। তখন চারপাশের শীতল ও ভারী বাতাস কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসে। এই কেন্দ্রমুখী ·উর্ধগামী প্রবল বায়ুপ্রবাহই ঘূর্ণবাত। উত্তর গোলার্ধে এই বায়ু ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে ঘুরে যায়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যই বায়ু এভাবে ঘুরে যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘূর্ণবাত বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—বাংলাতে এর নাম কালবৈশাখী ও আশ্বিনের ঝড়, বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন, চীনসাগরে টাইফুন, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হারিকেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর মোহনায় টর্ণেডো। টর্ণেডো অতি শক্তিশালী ঘূর্ণবাত। ঘূর্ণবাত সাধারণতঃ ক্ষণস্থায়ী।

প্রবল ঘূর্ণবাতে বায়ুর গতি ঘণ্টায় 70—120 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। এতে ঘরবাড়ি গাছপালা সবকিছুই ধুলিসাৎ হয়। প্রবল ঘূর্ণবাত কি করে ভারী বস্তুকেও অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে? ঘূর্ণবাত সম্বন্ধে এই ধরনের প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর এখনও জানা যায় নি।

এখানে ঘূর্ণবাতের একটি মডেল কিভাবে তৈরি করা যায় তা বলা হল।

প্রয়োজন ঃ একটি অতি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক মোটর, একটি বড় কাচের জার, একটি পাতলা আয়তাকার ধাতব চাকতি, মোটর চালাবার উপযুক্ত ব্যাটারি ও বৈদ্যুতিক তার।

প্রস্তুতি ঃ পাতলা চাকতির মাঝখানে একটি 25 সেন্টিমিটার লম্বা তার লম্বভাবে ঝালাই করে আটকে দাও। তারটা যেন সোজা থাকে। তারের অন্যপ্রান্ত মোটরের চক্রের (shaft) সঙ্গে ঝালাই করে দাও।

কাচের জারে জল নিয়ে চাকতিটি তার মধ্যে ডোবাও, মোটর জলের উপরে থাকবে। এখন মোটর চালিয়ে দিলে জলের উপরিতলে একটি শঙ্কু সৃষ্টি

হবে, শঙ্কুটি আস্তে আস্তে চাকতি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে (চিত্র 74)। এটাই হলে ঘূর্ণবাতের মডেল। ঘূর্ণযানটি চাকতি স্পর্শ করলে চাকতির চারপাশে অনেক বায়ু বুদবুদ দেখা যাবে। এতে বোঝা যায় চাকতির চারপাশে জলের একটি ঘূর্ণগতি বা ভর্টেক্স সৃষ্টি হয়েছে।



চিত্র 74 (পরীক্ষা 87)

আগে থেকে জলে যদি কোন ভাসমান জিনিস (যেমন কাঠের টুকরো) থাকে, তবে ঘূর্ণবাত তাকে জলের ভিতর টেনে নেবে। আবার আগে থেকে জলের নীচে কোন ভারী বস্তু থাকলে ঘূর্ণবাত তাকে কিছু উপরে টেনে তুলবে।

তার ঠিক জারের মাঝবরাবর (অক্ষরেখা বরাবর) ঝোলানো থাকলে চাকতির নীচেও শঙ্কু ও বায়ু-বুদবুদ দেখা যাবে। জলের নীচে কিছু পরিষ্কার বালি রেখে দিলে বালির গতি থেকে ঘূর্ণবাতের গঠন বোঝা যাবে। এই পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় তরল বা গ্যাসের ঘূর্ণগতি (ভর্টেক্স) থেকেই ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি।

আয়তাকার চাকতিটির দৈর্ঘ্য আড়াই সেন্টিমিটার, প্রস্থ এক সেন্টিমিটার ও বেধ আধ মিলিমিটারের মত হবে।

৮৮। ভারহীনতার খেলা।

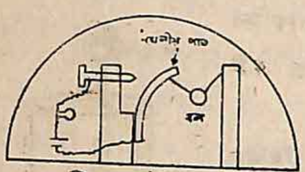
একটি বাধাহীনভাবে পতনশীল বস্তু, কোন কিছুকে উপরে ছুঁড়ে দিলে তার ওঠা ও নামা উভয় সময়, কৃত্রিম উপগ্রহ, কোন মানুষ যখন হাইজাম্প দেয় (লাফিয়ে ওঠা এবং পরে নামা উভয় সময়ই) এ সবই ভারহীন।

ভারহীনতা বলতে কি বোঝায় ? সাধারণ অবস্থায় কোন বস্তুকে উপরের দিকে তুলতে হলে সেই বস্তুর ওজনের চেয়ে বেশী বল উর্ধদিকে প্রয়োগ করতে হয়। যেমন একটি এক কিলোগ্রাম ভরের বই উপরে তুলতে হলে অন্ততঃ এক কিলোগ্রামের ওজনের সমান বল প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু ভারহীন পরিবেশে যে-কোন অতি সামান্য বল প্রয়োগ করলেই বইটি উপরে উঠে যাবে।

এখানে ভারহীনতার একটি সুন্দর খেলা বর্ণনা করা হল।

প্রয়োজন : একটি স্ক্রু, ধাতুর নমনীয় পাত, টর্চের ব্যাটারি ও বাল্ব, ভারী বল, বৈদ্যুতিক তার, একটি প্লেট ও তার স্বচ্ছ অর্ধগোলাকার ঢাকনা।

প্রস্তুতি ঃ চিত্র 75 এর মত একটি মডেল তৈরি কর। বল না থাকলে নমনীয় পাত স্ক্রু-এর সঙ্গে ঠেকে থাকে, ফলে বৈদ্যুতিক বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং


চিত্র 75 (পরীক্ষা ৪৭-৮৮)

বাল্বে আলো জ্বলে ওঠে। কিন্তু ভারী বল নমনীয় পাত ও একটি দণ্ডের সঙ্গে সুতো দিয়ে বেঁধে দিলে বল নিজের ওজনের জন্য ঝুলে পড়ে, ফলে স্ক্রু-এর সঙ্গে নমনীয় পাতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, বর্তনী ও ছিন্ন হয় এবং আলো নিভে যায়।

পদ্ধতি ঃ এবার এই মডেলটি উপরে ছুঁড়ে দিলে দেখা যাবে যতক্ষণ এটা বাতাসে থাকছে, (ওঠা ও নামা উভয় ক্ষেত্রেই) ততক্ষণ আলো জ্বলছে, কিন্তু মাটিতে এসে পড়লেই আলো নিভে যাচ্ছে।

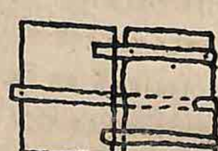
ব্যাখ্যা ঃ উপরে উঠা ও নামা উভয় সময়ই বল ভারহীন অবস্থায় থাকে ফলে তা ঝুলে পড়ে না আর নমনীয় পাত ও স্ক্রু-এর সঙ্গে ঠেকে থাকে। এতে বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং আলোও জ্বলে ওঠে।

৮৯। আশ্চর্য ব্যাগ!

প্রয়োজন ঃ পিজবোর্ড, কাগজ ও আঠা।

প্রস্তুতি ঃ দুটো সমান আকারের আয়তাকার পিজবোর্ড নাও। তিনটে লম্বা কাগজের ফালি বা ফিতে কাগজ কেটে তৈরি কর, দুটো হবে দৈর্ঘ্যে ছোট, অন্যটা বড়।

পিচবোর্ড দুটো পাশাপাশি রাখ। প্রত্যেক ছোট ফিতের এক প্রান্ত ডানদিকের পিচবোর্ডের নীচে ডানদিকে আঠা দিয়ে লাগাও, অন্যপ্রান্ত ডানদিকের পিচবোর্ডের উপর দিয়ে নিয়ে এসে বাঁ দিকের পিচবোর্ডের উপরের পিঠে আটকাও। বড় ফিতের একপ্রান্ত ডানদিকের পিচবোর্ডের উপরে ডানদিকে আঠা দিয়ে লাগাও। অন্যপ্রান্ত ডান দিকের পিচবোর্ডের তলা দিয়ে নিয়ে এসে বাঁ দিকের পিচবোর্ডের উপর দিয়ে তুলে বাঁ দিকের পিচবোর্ডের নীচে বাঁ-দিকে আটকাও (চিত্র ৭৬)।


চিত্র 76 (পরীক্ষা ৪৯)

এই হল তোমার আশ্চর্য ব্যাগ। এবার একটা কাগজ ডানদিকের পিচবোর্ডের উপরের ফিতে দুটোর নীচে ঢুকিয়ে রেখে ব্যাগটা বন্ধ করে দাও।

এখন উপরের পিচবোর্ডের বামপ্রান্ত উপরের দিকে টেনে তুলে ব্যাগটা খোল। সবাই অবাক হয়ে দেখবে কাগজটা ডানদিকের দুটো ফিতের তলা থেকে বাঁ-দিকের পিচবোর্ডের একটা ফিতের তলায় চলে এসেছে!

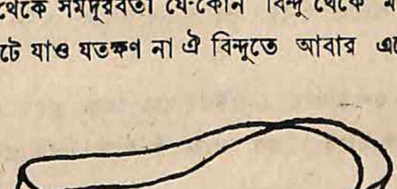
৯০। রিং এর মজা!

প্রয়োজন ঃ লম্বা কাগজ।

প্রস্তুতি ঃ লম্বা একফালি কাগজ কেটে নাও। ফালিটার যে-কোন এক প্রান্ত একবার মোচড় দিয়ে অন্য প্রান্তের সঙ্গে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। তাহলে একটা কাগজের রিং পাবে (চিত্র ৭৭)।

একটা সাধারণ রিং-এর ভিতরের দিক (তল) ও বাইরের দিক (তল) থাকে, কিন্তু এই রিং-এর বৈশিষ্ট্য হল—এর ভিতরের তল বাইরের তল বলে আলাদা কিছু নেই। যে-কোন এক তল থেকে চলতে শুরু করলে অন্য তলে যাওয়া যায়।

রিং‌টার দুধার থেকে সমদূরবর্তী যে-কোন বিন্দু থেকে মাঝবরাবর লম্বালম্বি কলম দিয়ে দাগ কেটে যাও যতক্ষণ না ঐ বিন্দুতে আবার এসে পৌঁছাও (চিত্র



চিত্র 77 (পরীক্ষা 90)

৭৭)। প্রয়োজন হলে রিং‌টা খুরিয়ে নেবে। এখন রিং‌টাকে প্রস্থবরাবর কাঁচি দিয়ে কেটে ফেল, একটা দুমুখ খোলা কাগজের ফালি পাবে। লক্ষ্য কর, এই ফালিটার দুপাশেই লম্বালম্বি দাগ কাটা রয়েছে; অর্থাৎ রিং‌টার একটা তলে দাগ কাটা শুরু করলেও তার উভয় তলেই দাগ কাটা হয়ে গিয়েছে। সাধারণ রিং হলে কিন্তু শুধু একটি তলেই দাগ থাকত।

এবার আর একটা মোচড়ান রিং তৈরি করে আগের মত দুধার থেকে সমদূরবর্তী যে-কোন বিন্দু থেকে মাঝবরাবর লম্বা লম্বি রিংটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেল। অবাক হয়ে দেখবে—দুটো সরু রিং-এর বদলে তুমি পেয়েছ একটা লম্বা রিং।

এখন এই লম্বা রিংটাকে আবার ঠিক আগের লম্বা-লম্বি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেল। এবার তুমি দুটো রিংই পাবে কিন্তু সে দুটো এমনভাবে আঁটকানো থাকবে যে, তুমি কিছুতেই তাদের আলাদা করতে পারবে না।

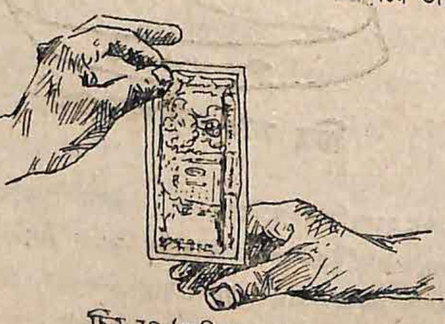
আর একটা মোচড়ান রিং তৈরি কর, কিন্তু এবার কাগজের ফালিটার এক প্রান্ত দুবার মুচড়ে তবেই দুটো প্রান্ত আঠা দিয়ে জোর। এবার আগের মতই এই রিংটা লম্বালম্বি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেল। এবারও দুটো রিং পাওয়া যাবে—যাদের কোনভাবে পৃথক করা যাবে না, কারণ একটার ভিতর দিয়ে আরেকটা ঢোকানো থাকবে।

৯১। ধরতে পারবে ?

প্রয়োজন : একটা দশ টাকার নোট।

পদ্ধতি : তোমার বন্ধু, যেন তার স্নুইফ্‌টনেস কত বেশী অর্থাৎ সে কত দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে পারে, তা হাতে-কলমে একটি পরীক্ষার সাহায্যে তোমাকে বোঝাচ্ছে!

সে একটা নতুন দশ টাকার নোটের (যার এক প্রান্ত ধরে থাকলে সেটা খাড়াভাবে নীচে ঝুলে থাকে) এক প্রান্ত বাঁ-হাত দিয়ে ধরে তার ডান-হাতের



চিত্র 74 (পরীক্ষা ৯১)

দুটো আঙুল একটু ফাঁক করে নোটটার নীচে রাখল। এখন বাঁ-হাত থেকে

নোটটা ছেড়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতে নোটটা ধরে ফেলল (চিত্র ৭৮)।

এভাবে সে কয়েকবার করল আর প্রতিবারই ডান হাত দিয়ে নোটটা ধরতে পারল অর্থাৎ একবারও তার হাত ফসকে নোটটা পড়ে গেল না।

এবার সে নিজে বাঁ-হাতে নোটটা ধরে তোমাকে বলল ঠিক তার মতই তোমার ডান হাতের দুটো আঙুল একটু ফাঁক করে নোটটার নীচে রাখতে। এখন সে নোটটা ছেড়ে দিল কিন্তু তুমি তা ধরতে পারলে না।

এরকম সে অনেকবার করল। তুমি কিন্তু একবারও নোটটা ধরতে পারলে না। সে তখন মুচকে হেসে বলল, তাহলে দেখছ তো আমি তোমার চেয়ে কত সুইফ্ট্! সত্যিই কি তাই?

ব্যাখ্যা ঃ না, আসলে যখন সে নোটটা ধরার চেষ্টা করছিল, যেহেতু সে একাই নোটটা ছাড়া ও ধরার কাজ করছে, তার মস্তিষ্ক একই সঙ্গে নোটটা ছাড়া ও ধরার নির্দেশ যথাক্রমে তার বাঁ ও ডান হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছিল।

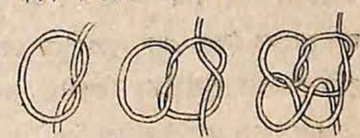
আর তুমি যখন নোটটা ধরার চেষ্টা করছ তখন তোমার মস্তিষ্ক নোটটা যে পড়ছে, তা বুঝতে পারার পরই তোমার ডান হাতে নোটটা ধরার নির্দেশ পাঠাচ্ছে। এতে কিছুটা সময় নষ্ট হচ্ছে, ফলে নোটটা তোমার হাত ফসকে নীচে পড়ে যাচ্ছে।

তাহলে বুঝতে পারছ—তুমি তোমার বন্ধুর চেয়ে বেশী সুইফ্ট্ হলেও নোটটা ধরতে পারবে না।

৯২। রহস্যময় গিঁট!

প্রয়োজন ঃ একটি দড়ি।

পদ্ধতি ঃ একটা লম্বা দড়ি নিয়ে তাতে ৭৯ নম্বর চিত্রের বাঁ-দিকের মত একটা আলগা গিঁট দাও। আবার ৭৯ নম্বর চিত্রের মাঝখানের মত এতে আর একটা গিঁট দাও। এবার বাঁধনটাকে আরো শক্ত করার জন্য দড়ির একটা প্রান্তকে ঠিক ৭৯ নম্বর চিত্রের ডানদিকের মত পেঁচিয়ে নাও।



চিত্র 79 (পরীক্ষা ৯২)

এখন দড়ির একটা প্রান্ত ধরে তুমি টান আর একটা প্রান্ত ধরে তোমার কোন বন্ধুকে টানতে বল। কি মনে হবে? দড়িতে খুব শক্ত করে একটা গিঁট পড়ে যাবে?

তুমি আশ্চর্য হয়ে দেখবে, দু তিনটে গিঁট পড়া দূরের কথা, দড়িটা পেঁচিয়ে এভাবে টানার ফলে দড়িতে আগে যে দুটো গিঁট দেওয়া হয়েছিল, সে দুটোও খুলে গেল !

৯৩। বিদ্যুৎ চৌম্বক আবেশের খেলা !

প্রয়োজন ঃ একটি কাঠের বা পিচবোর্ডের ফাঁপা চোঙ বা মোটা নল, অন্তরিত তার, একটি দণ্ড চুম্বক ও একটি অল্প তড়িৎ প্রবাহ পরিমাপে সক্ষম আমমিটার (Ammeter)।

পদ্ধতি ঃ ফাঁপা চোঙের চারপাশে অন্তরিত তার অনেকবার জড়িয়ে তার দুই প্রান্ত অ্যামমিটারের সঙ্গে যুক্ত কর। এবার চুম্বকের যে-কোন মেরু চোঙের ভিতরে দ্রুতগতিতে প্রবেশ করাও। সঙ্গে সঙ্গে অ্যামমিটারে কাঁটা একদিকে সরে যাবে। চুম্বককে চোঙের ভিতর থেকে বার করে আনলে অ্যামমিটারের কাঁটা বিপরীত দিকে সরে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ যখনই কোন বদ্ধ কুণ্ডলীর মধ্যে চৌম্বক বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তন হয়, তখনই কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। একে বলে তড়িৎ চৌম্বক আবেশ। কুণ্ডলী ও চুম্বকের মধ্যে আপেক্ষিক গতি থাকলে যেমন চুম্বক বা কুণ্ডলীর যে-কোন একটি স্থির রেখে অন্যটি গতিশীল করলে, কুণ্ডলীতে চৌম্বক বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয় ও অ্যামমিটারের কাঁটা ঘুরে যায়।

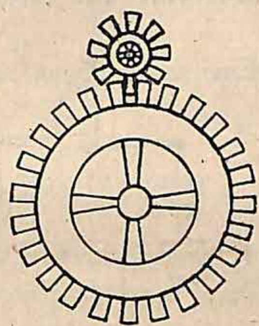
তড়িৎ প্রবাহের দিক ফ্যারাডের তড়িৎ চৌম্বক আবেশের সূত্র (Faraday's Laws of Electromagnetic Induction) থেকে জানা যায়। কুণ্ডলীতে চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাতে বিপরীত দিকে আর হ্রাস পেলে একই একই দিকে প্রবাহ হয়। চুম্বককে কুণ্ডলীতে প্রবেশ করাবার সময় কুণ্ডলীতে বলরেখার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও বার করার সময় বলরেখার সংখ্যা হ্রাস পায় ; যেমন— যদি চুম্বকের উত্তর মেরু কুণ্ডলীতে প্রবেশ করানো হয় তবে বলরেখার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কুণ্ডলীতে বিপরীত অর্থাৎ চুম্বককে সোলেনয়েড (solenoid) হিসাবে ধরলে তার প্রবাহের বিপরীত দিকে প্রবাহ সৃষ্টি হয়। চুম্বকের দক্ষিণ মেরু তোমার থেকে দূরে ও উত্তর মেরু তোমার কাছে থাকলে চুম্বক-সোলেনয়েডর প্রবাহ হয় ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ; ফলে কুণ্ডলীর প্রবাহ হয় ঘড়ির কাঁটার দিকে।

এই নিয়মে সব ক্ষেত্রেই প্রবাহের দিক নির্ণয় করা যায়।

কয়েকটি প্রশ্ন

১। ছোট চাকা কতবার ঘুরবে ?

চব্বিশ দাঁতওয়ালা একটি চাকার সঙ্গে আট দাঁতওয়ালা একটি চাকা জুড়ে



চিত্র ১ (প্রশ্ন ১)

দেওয়া আছে (চিত্র ১)। বড় চাকার চারপাশে একবার ঘুরে আসতে ছোট চাকা নিজে কবার পাক খাবে ?

২। বেলুন কত উপরে উঠবে ?

বলতো একটা বেলুন কতটা উপরে উঠতে পারে ?

৩। ঘরের বাতাসের ওজন কত ?

একটা মাঝারি ধরনের ঘরে যতটা বাতাস ধরে, তার ওজন কত ? এতটা ওজন কি তুমি একটা আঙুলের সাহায্যে তুলতে পারবে নাকি দুহাত দিয়েও তুলতে পারবে না ?

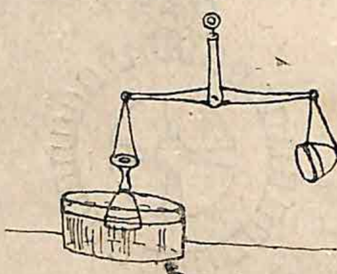
৪। উল্টানো জলভরা গ্লাসের জলের ওজন কত ?

আচ্ছা বলতো একটি উল্টানো জলভর্তি গ্লাসের জলের ওজন কত ?

তুমিতো বলবে, উল্টানো গ্লাসে জল থাকবেই না, তাহলে তার ওজন বার করা যাবে কি করে ?

কিন্তু যদি এরকমভাবে জল রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তবে তার ওজন কত হবে ?

মনে কর, একটা জলভর্তি গ্লাস একটা জলভর্তি বড় পাত্রের উপর উপুড় করে রাখা হল যেন গ্লাসের মুখ পাত্রের জলের নীচে ডোবানো থাকে, তাহলে গ্লাস



চিত্র ২ (প্রশ্ন 4)

থেকে জল পড়ে যাবে না। এবার এই গ্লাসটাকে একটা তুলাদণ্ডের একদিকের তুলাপাত্রের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল আর অন্যদিকের তুলাপাত্রে একটা সমান আকারের খালি গ্লাস রাখা হল (চিত্র ২)।

তাহলে তুলাদণ্ড কি অনুভূমিক থাকবে ? অর্থাৎ উভয় দিকের ওজন কি সমান ?

৫। কোন্ দিকে ফেলবে ?

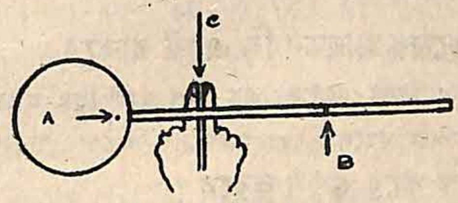
মনে কর, তুমি একটা গাড়ি করে যাচ্ছ। এখন চলন্ত গাড়ি থেকে একটা বোতল বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে হলে কোন্ দিকে ফেলবে যাতে বোতলটা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে ? যেদিকে গাড়িটা যাচ্ছে, সেদিকে, না তার বিপরীত দিকে ?

৬। বেলুন উঠবে না নামবে ?

একটা বেলুন বাতাসে স্থির ভাবে ভাসছে। একজন লোক সিঁড়ি বেয়ে বেলুনের নীচ থেকে উপরের দিকে উঠলে বেলুনের কি হবে ? উঠবে না নামবে ? নাকি এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকবে ?

৭। দুদিকের ওজন কি সমান?

একটা কাঠির একদিকে একটা বল আটকানো। তোমার দুই হাতের দুই তর্জনীর উপর কাঠিটা রাখা আছে। এবার দুই তর্জনী ধীরে কাছাকাছি এনে পরস্পর সংলগ্ন কর। কাঠি তোমার দুই তর্জনীর উপরই সাম্যাবস্থায় থাকবে।



চিত্র ৩ (প্রশ্ন 7)

কাঠির যে জায়গা ঠিক তোমার দুই তর্জনীর মাঝখানে আছে, সেখানে একটা চিত্র দিয়ে কাঠিটা তর্জনী থেকে তুলে নাও। চিহ্ন বরাবর কাঠিটা দু' টুকরো করে ফেল (চিত্র ৩)।

তাহলে এই দুই টুকরোর ওজন কি সমান হবে?

৮। কোন্‌টা বেশী ভারী?

একটি তুলাযন্ত্রের বাঁ-দিকের পাত্রে একটি জলে সম্পূর্ণ ভর্তি বাটি রাখা আছে। আর ডানদিকের তুলাপাত্রের উপরেও একই ধরনের একটি বাটি আছে। এই বাটিটাও জলে সম্পূর্ণ ভর্তি, তবে এই বাটির জলে একটা কাটের টুকরো ভাসছে।

এখন বল, তুলাদণ্ড কি অনুভূমিক থাকবে? অর্থাৎ দুদিকের বাটির ওজন কি সমান?

৯। ওজন কি কমে যাবে?

একটি তুলাযন্ত্রের বাঁ-দিকে তুলাপাত্রে একটি আংশিক জলপূর্ণ গ্লাস আছে। আর একটি লোহার বল এই বাঁ-দিকের তুলাপাত্রেই রাখা আছে, কিন্তু তা আছে গ্লাসের বাইরে।

এই গ্লাস ও বলের মোট ওজন ৬০০ গ্রাম। এখন বলটাকে গ্লাসের জলের ভিতর ডুবিয়ে দিলে তাদের মোট ওজনের কি হবে?

আর্কিমিডিসের সূত্রানুযায়ী বলটাকে গ্লাসের জলে ডুবিয়ে দিলে বলের ওজন কমে যাওয়ার কথা। তাহলে তাদের মোট ওজন কি কমে যাবে?

১০। এই পার্থক্য কেন ?

তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছ ঠাণ্ডা পানীয় খাওয়ার জন্য মোটা বা পুরু কাচের গ্লাস ব্যবহার করা হয়, পক্ষান্তরে গরম পানীয় খাওয়া হয় পাতলা কাচের গ্লাসে।

এই পার্থক্য কেন ?

১১। ছিদ্রের আয়তন কি একই থাকবে ?

একটি লোহার নিরেট গোলকের এক পাশে একটি ছিদ্র আছে।

গোলকটাকে গরম করলে ছিদ্রের আয়তনের কি কোন পরিবর্তন হবে ?

১২। কি করে ওজন করবে ?

সঠিক বাটখারা ও একটি ত্রুটিপূর্ণ তুলাযন্ত্রের সাহায্যে কি ভাবে এক কিলোগ্রাম চাল সঠিক ভাবে মেপে নেওয়া যায় ? কি ভাবেই বা একটি লোহার বলের সঠিক ওজন বার করা সম্ভব ?

১৩। সবচেয়ে বেশী কত ওজন তুলতে পারবে ?

মনে কর তুমি পুলি বা কপিকলের সাহায্যে একটা ভারী জিনিস উপরে তুলছ। পুলিটা যদি স্থির থাকে, তবে তুমি এভাবে সবচেয়ে বেশী কত ওজন তুলতে পারবে ?

১৪। কোন্‌টা বেশী কাদায় ডুবে যাবে ?

একটা হাতীর ওজন এক টন, আর একটা জলভর্তি লোহার ট্যাঙ্কের ওজনও এক টন।

কাদামাটিতে কোন্‌টা বেশী ডুবে যাবে ? কেন ?

১৫। খাঁচার ওজন কত হবে ?

একটা সরু তারের খাঁচার ওজন পাঁচ কিলোগ্রাম আর একটা পাখীর ওজন এক কিলোগ্রাম। পাখীটা যদি খাঁচার ভিতর—খাঁচা কোনভাবে স্পর্শ না করে ভেসে থাকে, তবে স্প্রিং ব্যাল্যান্সের সাহায্যে ওজন করলে খাচার ওজন কত হবে ?

খাঁচাটা কাচের তৈরি হলেই বা তার ওজন কত হবে ?

১৬। জলের তল কি একই থাকবে ?

একটা গ্লাসে কিছু জলের মধ্যে এক টুকরো বরফ ভাসছে। বরফটা গলে

জলে পরিণত হলে গ্লাসের জলের তল কি উপরে উঠবে, না নীচে নামবে, নাকি একই থাকবে?

গ্লাসে জলের বদলে জলের চেয়ে বেশী ঘনত্বের বা কম ঘনত্বের তরল থাকলেই বা কি হবে?

১৭। সব গভীরতাতেই কি সমান বল লাগবে?

একটি বায়ুপূর্ণ টেস্ট টিউবের খোলা মুখ নীচের দিকে রেখে টেস্ট টিউবটি একটি বড় পাত্রের জলে ডোবানো হল। টেস্ট টিউবটিকে জলে ডুবিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বল কি পাত্রের জলের সব গভীরতাতেই সমান?

১৮। জলের তল কি পরিবর্তিত হবে?

আগের ১৬ নম্বর প্রশ্নে বরফের ভিতর (i একটি বড় বায়ুপূর্ণ বুদবুদ অথবা (ii) এক টুকরো কাঠ অথবা (iii) এক টুকরো লোহা থাকলে সব বরফ গলে জলে পরিণত হলে গ্লাসের জলের তলের কি পরিবর্তন হবে?

১৯। বরফ কোথায় রাখবে?

তুমি এক বোতল জল বরফের সাহায্যে ঠাণ্ডা করতে চাও।

এখন বল তো বরফ কোথায় রাখবে? বোতলের উপরে না নীচে?

২০। গরম লাগে না কেন?

একটা সিদ্ধ ডিমকে ফুটন্ত জল থেকে তুলে আনার পর অল্প কিছুক্ষণ হাতে খুব একটা গরম লাগে না। কেন? কিছু পরেই বা বেশী গরম বোধ হয় কেন?

২১। জল কি করে আগুন নেভায়?

জলের সাহায্যে যে আগুন নেভানো হয়, তা জল কি ভাবে আগুন নেভায়?

২২। শিখা নিজে থেকে নিভে যায় না কেন?

কোথাও আগুন জ্বললে সাধারণতঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। এরা উভয়েই অদাহ্য, তাহলে আগুনের শিখা কতকগুলো অদাহ্য পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত থাকছে। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে অক্সিজেনের অভাবে শিখা নিজে থেকেই নিভে যায় না কেন?

২৩। চুম্বকের কি হবে?

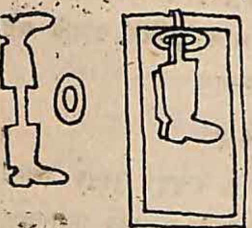
একটি চুম্বকের সাহায্যে অনেকগুলি লোহার দণ্ডকে ঘর্ষণের দ্বারা চুম্বকে পরিণত করলে ঘর্ষণকারী চুম্বকের চৌম্বক ক্ষমতা বা দৈর্ঘ্য কি কমে যাবে?

২৪। কোন্‌টি বেশী ভারী ?

এক টন সোনা আর এক টন জলের মধ্যে কোন্‌টির ওজন বেশী ?

২৫। এতটুকু রিং-এর ভিতর দিয়ে এত বড় জুতো গলল কি করে ?

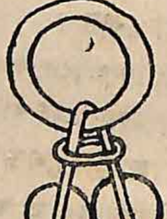
একটা মোটা কাগজ দিয়ে একটি রিং ও একটি ফ্রেম তৈরি কর। কাগজের ফালি দিলে পরস্পর যুক্ত একজোড়া কাগজের জুতো বানাও। ফ্রেম যতটা চওড়া বা মোটা রিং এর ছিদ্র, তার চেয়ে বড় হবে কিন্তু জুতোর পা যেন রিং-এর ভিতর দিয়ে না গলতে পারে। এবার জুতোজোড়াকে ফ্রেমের উপর 4 নম্বর চিত্রের মতঝুলিয়ে রাখতে হবে। চেষ্টা করে দেখ পার কিনা।



চিত্র 4 (প্রশ্ন ২৫)

২৬। রিং-এ বল পরাও দেখি !

একটা মোটা কাগজ কেটে একটি বড় ও একটি ছোট রিং তৈরি কর। দুটো বল সুতো দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত কর। ছোট রিং এর ফাঁকের মধ্য দিয়ে যেন কোন বলই যেতে না পারে।



চিত্র 5 (প্রশ্ন 26,

এখন ৫ নম্বর চিত্রের মত বলদুটোকে বড় রিং থেকে ঝোলাও তো !

২৭। বোতাম খুলতে পারবে ?

একফালি লম্বা কাগজে দুটো সমান্তরাল লাইন বরাবর লম্বাভাবে কাট ; কেটে

একেবারে বাদ দেবে না কিন্তু। এই দুটো লম্বা কাটার নীচে একটা ডিম্বাকার ছিদ্র কর।



চিত্র 6 (প্রশ্ন 27)

একটা সুতোর এক প্রান্ত ডিম্বাকার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে বাঁ-দিকের লম্বা কাটার মধ্য দিয়ে গলিয়ে ডান দিকের লম্বা কাটার মধ্য দিয়ে উপরে তুলে আন। এই প্রান্তটা আবার ডিম্বাকার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে গলিয়ে বাইরে বার করে আন। এবার সুতোর উভয় প্রান্তেই একটা করে বোতাম বেঁধে দাও। বোতামদুটোর আকার ডিম্বাকার ছিদ্রের চেয়ে বড় হওয়া চাই (চিত্র ৬)।

এখন সুতোসহ বোতামদুটো কি করে কাগজের ফালি থেকে আলাদা করবে ?

২৮। কোন্‌টি আগে পড়বে ?

একই ধাতুর একই ব্যাসার্ধের একটি নিরেট ও একটি ফাঁপা গোলক বায়ুর মধ্যে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে কোন্‌টি আগে মাটিতে পড়বে ?

২৯। নৌকার কি হবে ?

তুমি একটি ছোট নৌকার উপর দিয়ে হেঁটে গেলে নৌকার কি হবে ?

৩০। পৃথিবী থেকে সবসময় চাঁদের একই অর্ধ দেখা যায়। এর কারণ কি ?

৩১। উপগ্রহের ভিতরে ভারশূন্য মনে হয় কেন ?

পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণরত কোন কৃত্রিম উপগ্রহের ভিতরে নিজেকে ভারশূন্য মনে হয় কেন ?

৩২। তেলের আগুন কি জল ঢেলে নেভানো যায় ?

৩৩। বাঁশির সুরের তীক্ষ্ণতা।

বাতাসের উষ্ণতা বা আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে বাঁশির সুরের তীক্ষ্ণতাও কি বৃদ্ধি পাবে ?

৩৪। লোকভর্তি ঘরের শব্দ ক্ষীণ হয় কেন ?

৩৫। বজ্রপাতের সময় ঘরের বাইরে থাকলে কি করা উচিত ?

৩৬। বিদ্যুৎপ্রবাহ চালু থাকলে হিটারের তার গরম হয় অথচ সংযোগকারী তামার তার গরম হয় না কেন ?

৩৭। একটা ২০০ ওয়াট বাল্বের রোধ বেশী না একটা ১০০ ওয়াট বাল্বের ?

৩৮। ধনাত্মক আয়নের তুলনায় ইলেকট্রন সহজে চলাচল করতে পারে কেন ?

৩৯। তড়িৎ প্রবাহ কি শুধু ইলেকট্রনের গতি নাকি ধনাত্মক আয়নের গতিও তড়িৎ প্রবাহ ?

৪০। কোন ঘরে একটি চালু ফ্রিজ থাকলে কি ঘরের উষ্ণতার পরিবর্তন হয় ?

৪১। নীল চশমা দিয়ে গাছের সবুজ পাতার দিকে তাকালে পাতার রং কি রকম মনে হবে ?

৪২। লিসাজো চিত্র কাকে বলে ?

৪৩। একটি চালু টেলিভিশনের সাহায্যে কি কোন চুম্বকের মেরু নির্ণয় করা যায় ?

৪৪। বলতে পার অনু পরমানু ইত্যাদির ব্যাস কত ?

৪৫। আকাশকে নীল দেখায় কেন ?

৪৬। সমুদ্র কেন নীল ?

৪৭। ভোর ও সন্ধ্যায় সূর্য লাল কেন ?

৪৮। একটি বিদ্যুৎবাহী তারে ইলেকট্রনের গতিবেগ কত ?

৪৯। চাঁদকে দিনে সাদা কিন্তু রাত্রে হলদে দেখায় কেন ?

৫০। পরিপূরক বর্ণ কাকে বলে ?

৫১। আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার

সময় তার গতিবেগ, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের কোন পরিবর্তন হয় কি ?

৫২। কোন ব্যক্তি জলে নিমজ্জিত অবস্থায় কোন বস্তুর স্বাভাবিক রং বুঝতে পারে কি ?

৫৩। কোন মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের আলোর গতিবেগ কি বিভিন্ন ?

৫৪। সূর্যের বিকিরিত শক্তির কত অংশ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় ?

৫৫। প্রতিপ্রভা, অনুপ্রভা ও তাপাপন বলতে কি বোঝায় ?

৫৬। বলতো কোন্ আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কত ?

৫৭। ঝড়ের ফলে সমুদ্র অশান্ত হলে তাতে তেল ঢাললে সমুদ্র শান্ত হয়ে পড়ে। কেন ?

৫৮। পৃথিবীর কোন্ স্থানে একটি ছোট চুম্বককে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে রাখলে তা উলম্ব (খাড়া) হয়ে থাকে ?

৫৯। ভারী পরমানুর আয়তন লঘু পরমাণুর তুলনায় খুব বেশী বড় হয় না। কেন ?

৬০। $_{11}Na^{23}$ এর অর্থ কি ?

৬১। বলতো আলফা (α), বিটা (β) ও গামা (γ) রশ্মি কাকে বলে ?

৬২। বল দেখি নীচের সমীকরণে x এর মান কত ?

$$_{1}H^{2} + {}_{11}Na^{23} = {}_{11}Na^{x} + {}_{1}H^{1}$$

৬৩। বলতো নীচের বিক্রিয়ায় x কি বোঝাচ্ছে ?

$$_{4}Be^{9} + {}_{2}He^{4} = {}_{6}C^{12} + x$$

৬৪। ইলেকট্রন ভোল্ট কিসের একক ?

৬৫। ফিসান কাকে বলে ?

৬৬। চেন রিঅ্যাকসান কি ?

৬৭। ফিউসান কাকে বলে ?

৬৮। সূর্যের আকর্ষণ বল কোন কাজ করে কি ?

সূর্য পৃথিবীকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করার ফলে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে। সূর্যের আকর্ষণ বল পৃথিবীকে ঘোরাতে গিয়ে কোন কাজ করে কি ?

৬৯। লেজার কাকে বলে ?

৭০। ন্যানো মানে কি ?

৭১। এক গ্রাম ভর থেকে কতটা শক্তি পাওয়া যায় ?

৭২। বস্তুর গতিবেগ বৃদ্ধি পেলে ভর কিভাবে বৃদ্ধি পায় ?

৭৩। মিঙ্কোয়াস্কি কাল্পনিক সময় অক্ষ কি ?

৭৪ মেসন ও নিউট্রিনো কি ,

৭৫। বিপরীত পদার্থ কাকে বলে ?

৭৬। কৃত্রিম মৌলান্তর ও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা কি ?

৭৭। রেডিও কার্বন ডেটিং কাকে বলে ?

৭৮। ভর ত্রুটি কি ?

৭৯। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা কাকে বলে ?

৮০। নিয়ন্ত্রিত তাপ-নিউক্লিয় বিক্রিয়া কাকে বলে ?

৮১। সাইক্লোট্রন কি ?

৮২। অ্যাস্ট্রনমিক্যাল একক ও পারসেক কি ?

৮৩। গ্যালাক্সি ও নেবুলা কাকে বলে ?

৮৪। ছায়াপথ গ্যালাক্সি কি ?

৮৫। যুগল নক্ষত্র ও পরিবর্তনশীল নক্ষত্র কি ?

৮৬। লাল দৈত্য, শ্বেত বামন, নিউট্রন নক্ষত্র ও ব্ল্যাক হোল কাকে বলে ?

৮৭। পালসার ও কোয়াসার কাকে বলে ?

৮৮। নোভা ও সুপারনোভা কি ?

৮৯। মহাজাগতিক রশ্মি কাকে বলে ?

৯০। মহাজাগতিক রশ্মির শাওয়ার কি ?

৯১। ভ্যান অ্যালেন বলয় কাকে বলে ?

৯২। মহাকাশের রেডিও ও এক্সরে উৎস কি ?

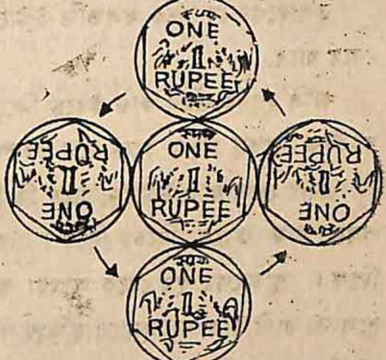
৯৩। মুক্তি বেগ কাকে বলে ?

কিছু প্রশ্নের উত্তর

১। ছোট চাকা ক'বার ঘুরবে ?

ছোট চাকা কিন্তু তিনবার ঘুরবে না, ঘুরবে চারবার।

এটা বুঝতে হলে দুটো এক টাকার মুদ্রা নাও। এখন একটা মুদ্রা স্থির ভাবে ধরে রেখে অন্য মুদ্রাটা প্রথম মুদ্রার চারপাশে ঘোরাও। দেখবে দ্বিতীয় মুদ্রা প্রথম মুদ্রার চারপাশে একবার সম্পূর্ণ ঘুরে আসতে নিজে দু'বার পাক খাবে (চিত্র ১)।



চিত্র ১(উত্তর।)

সাধারণভাবে বলতে গেলে কোন গোল জিনিষ অন্য কোন গোল জিনিষের চারপাশে একবার ঘুরে এলে সে নিজে ঘুরবে আমাদের হিসেবে যা হবে তার চেয়ে একবার বেশী। এখানে ছোট চাকার সাধারণ হিসেবে ২৪/৮ বা ৩ বার ঘোরার কথা তাই তা আসলে ঘুরবে ৪ বার।

২। বেলুন কত উপরে উঠবে ?

বেলুন কখনও বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে পারে না। যত উপরে ওঠা যায় বাতাসের ঘনত্ব তত কমে যায়, ফলে একটা উচ্চতায় বেলুনের ওজন আর অপসারিত (অর্থাৎ বেলুনের সমায়তন) বাতাসের ওজন সমান হয়ে যায়। বেলুন এই উচ্চতায় এসে আর উপরে উঠতে পারে না, অর্থাৎ এখানেই থেকে যায়।

কিন্তু অনেক সময় বেলুন এই উচ্চতাতেও উঠতে পারে না। বেলুন যত উপরে ওঠে বাইরের বাতাসের চাপ তত কমে যায় ফলে বেলুন ফুলতে থাকে। এতে অনেক সময় বেলুন আগেই ফেটে যায়।

৩। ঘরের বাতাসের ওজন কত ?

মাটির কাছাকাছি এক লিটার বাতাসের ওজন প্রায় ১১ গ্রাম। তাহলে এক ঘন মিটার (অর্থাৎ একহাজার লিটার) বাতাসের ওজন ১১০০ গ্রাম বা ১·১ কিলোগ্রাম।

একটা সাধারণ ঘরের দৈর্ঘ্য ১২ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট এবং উচ্চতা ১১ ফুট ধরা যেতে পারে। তাহলে এর ঘনফল প্রায় ৪০ ঘন মিটার (এক মিটার প্রায় সোয়া তিন ফুটের সমান)। সুতরাং একটা সাধারণ ঘরের বাতাসের ওজন মোটামুটি ৪০ × ১.১ কিলোগ্রাম বা ৪৪ কিলোগ্রাম। এই ওজন তোমার এক হাত দিয়ে তুলতেও কষ্ট হবে।

8। উল্টানো জলভরা গ্লাসের জলের ওজন কত ?

তুলাদণ্ডের যে দিকে জলভর্তি উল্টানো গ্লাস বাঁধা আছে সেই দিকটা নিচে নেমে যাবে।

খালি গ্লাসের ওজন কাজ করছে নিচের দিকে আর এর উপর বাতাসের চাপ সবদিক থেকেই প্রযুক্ত হচ্ছে বলে পরস্পর কাটাকুটি হয়ে যাচ্ছে।

এবার দেখা যাক উল্টানো গ্লাসে কি কি বল প্রযুক্ত হচ্ছে। এরও (শুধু গ্লাসের) ওজন কাজ করছে নিচের দিকে। আর এর উপর বাতাস চাপ দিচ্ছে নিচের দিকে। পাস্কালের সূত্র থেকে আমরা জানি তরলের উপর কোন চাপ প্রযুক্ত হলে তা চারিদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং বড় পাত্রের জলের উপর বাতাস যে চাপ দিচ্ছে তাও জলের ভিতর সর্বত্র প্রযুক্ত হচ্ছে। তাহলে উল্টানো গ্লাসের ভিতরের জল গ্লাসের ভিতর থেকে উপর দিকে যে চাপ দেবে, তা হবে বায়ুর চাপ থেকে গ্লাসের জলের ওজন বাদ দিলে যা হয় তার সমান।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে খালি গ্লাসের তুলনায় উল্টানো গ্লাসে একটি বেশী বল কাজ করছে আর তা হল গ্লাসের জলের ওজন যা কাজ করছে নিচের দিকে। এইজন্যই উল্টানো গ্লাসের দিকটা নিচে নেমে যাচ্ছে।

এখন খালি গ্লাসটা জলে ভর্তি করলে তুলাদণ্ড আবার অনুভূমিক হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে উল্টানো জলভরা গ্লাসের ওজন সোজা জলভরা গ্লাসের ওজনের সমান।

৫। কোন্ দিকে ফেলবে ?

বোতল পিছন দিকে (যে দিকে গাড়ি যাচ্ছে তার বিপরীত দিকে) ফেলতে হবে।

গতিজাড্যের জন্য বোতল গাড়ির সমান গতিতে সামনের দিকে যাচ্ছে। এই অবস্থায় বোতলটা পিছনের দিকে ছুঁড়লে তার সামনের গতিবেগ থেকে পিছনে ছোঁড়ার গতিবেগ বিযুক্ত হবে, ফলে তার গতিবেগ কমে যাবে, আর বোতলটা কম জোরে মাটিকে আঘাত করবে, এতে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।

বোতল সামনের দিকে ছুঁড়লে তার গতিবেগ বেড়ে যাবে ফলে তা বেশী জোরে মাটিকে আঘাত করবে।

৬। বেলুন উঠবে না নামবে?

বেলুন নিচে নেমে যাবে।

যখন কেউ সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে তখন সে সিঁড়িকে নিচের দিকে চাপ দেয়। নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী সিঁড়িও তার উপর উপরের দিকে বল প্রয়োগ করে আর তাতেই সে উপরে উঠতে পারে। এখানেও উঠতে গিয়ে লোকটি সিঁড়িতে নিচের দিকে চাপ দেয়, ফলে বেলুনও নিচে নেমে যায়।

৭। দু'দিকের ওজন কি সমান?

কাঠির দুটো অংশ (টুকরো) তোমার তর্জনীর উপর পরস্পরকে ব্যালেন্স করায় মনে হবে টুকরো দুটোর ওজন সমান। আসলে কিন্তু যে অংশে বল রয়েছে সেই অংশের ওজন বেশী।

প্রশ্নের ৩ নম্বর চিত্রে A এবং B যথাক্রমে কাঠির বাঁ এবং ডান দিকের অংশের ভারকেন্দ্র, কাঠি যেখানে ভাঙা হয়েছে তা হল C। কাঠির বাঁ এবং ডানদিকের অংশের ওজন যথাক্রমে W_1 এবং W_2 হলে সমান্তরাল বলের নীতি থেকে আমরা পাই $W_1 \times AC = W_2 \times BC$ বা $\frac{W_1}{W_2} = \frac{BC}{AC}$

আবার কাঠির বাঁ দিকের অংশে বলটা থাকায় AC, BC-র সমান বা বড় হলে উভয় ক্ষেত্রেই W_1, W_2 এর চেয়ে বড় হবে। তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই $W_1 \times AC$, $W_2 \times$ BC-র চেয়ে বড় হবে যা আগের মূল নীতির বিরোধী। সুতরাং AC, BC-র চেয়ে অবশ্যই ছোট হবে। তাহলে আগের নীতি অনুসারে W_1, W_2 এর চেয়ে সর্বদা বড় হবে। অর্থাৎ যে অংশে বল আছে তা বেশী ভারী।

৮। কোন্‌টা বেশী ভারী?

দুদিকের ওজনই সমান।

যে কোন বস্তু যখন কোন তরলে ভাসে তখন নিজের সমান ওজনের তরল অপসারণ করে। এখানে ডান দিকের বাটিতে কাঠের টুকরো ভাসছে বলে জল কিছু কম আছে। কিন্তু যতটা জল কম আছে তার ওজন ঠিক কাঠের টুকরোর ওজনের সমান। এইজন্য দুটো বাটির ওজন সমান।

৯। ওজন কি কমে যাবে ?

মোট ওজন একই থাকবে।

লোহার বলটা গ্লাসের জলে ডুবিয়ে দিলে বলের ওজন কমে যাবে ঠিকই তবে সেইসঙ্গে গ্লাসের জলের উচ্চতাও কিছু বেড়ে যাবে।

লোহার বলের আয়তন a ঘন সেন্টিমিটার হলে অপসারিত জলের আয়তনও a ঘন সেমি. আর এর ওজন a গ্রাম। তাহলে বলের ওজন a গ্রাম কমে যাবে। আবার গ্লাসের উপরিতলের ক্ষেত্রফল b বর্গ সেমি. হলে বল ডোবানোর ফলে জলের গভীরতা বাড়বে $\frac{a}{b}$ সেমি.। জলের গভীরতা বৃদ্ধির ফলে গ্লাসের উপর জলের মোট চাপও বেড়ে যাবে আর এই বৃদ্ধির পরিমাণ হবে $\frac{a}{b} \times b$ গ্রাম বা a গ্রাম।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বলের ওজন যতটা কমল জলের মোট চাপও ততটা বাড়ল। ফলে তাদের মোট ওজন আগের মতই ৬০০ গ্রাম থাকবে।

আগের পরীক্ষাটাও ('কোনটা বেশী ভারী') এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কাঠটা জলে ভাসছে বলে জলের উর্দ্ধচাপের জন্য কাঠের কোন ওজন নেই। কিন্তু দুটো বাটিই জলে ভর্তি বলে দুটো বাটিতেই জলের উচ্চতা সমান। সুতরাং দুটো বাটির তলদেশে জলের মোট চাপও সমান। ফলে তুলাদণ্ড অনুভূমিক থাকে।

১০। এই পার্থক্য কেন ?

মোটা কাচের গ্লাস হাত থেকে পড়ে গেলে ভেঙে যাবার সম্ভাবনা কম তাই সাধারণ (ঠাণ্ডা) পানীয়ের জন্য এই গ্লাসই ভাল।

অপরদিকে কাচ তাপের কুপরিবাহী হলে মোটা কাচের গ্লাসে গরম পানীয় রাখলে গ্লাসের ভিতরের দিক বাইরের দিকের চেয়ে অনেক বেশী গরম হবে। ফলে ভিতরের দিক বাইরের চেয়ে অনেক বেশী প্রসারিত হবে। আর এই অসম প্রসারণের ফলে গ্লাস ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। কিন্তু পাতলা গ্লাসের ক্ষেত্রে ভিতরে বাইরে উষ্ণতার পার্থক্য হবে কম। ফলে প্রসারণের পার্থক্যও হবে অল্প। এতে গ্লাস ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

১১। ছিদ্রের আয়তন কি একই থাকবে ?

ছিদ্রের আয়তন বৃদ্ধি পাবে।

গরম করলে যে কোন ছিদ্রের আয়তন, ছিদ্রের সমায়তন চারপাশের বস্তুর

আয়তন যতটা বৃদ্ধি পাবে, ঠিক ততটাই বৃদ্ধি পায়। এতে বোঝা যাচ্ছে কেটলি বা যে কোন পাত্রের আয়তন গরম করলে বৃদ্ধি পায়।

১২। কি করে ওজন করবে ?

ডানদিকের তুলাপাত্রে এক কিলোগ্রাম বাটখারা বসাও, বাঁ দিকের পাত্রে চাল বা অন্য যে কোন জিনিস এতটা পরিমাণে রাখ যাতে তুলাদণ্ড অনুভূমিক থাকে। এবার ডানদিকের পাত্র থেকে বাটখারা সরিয়ে নিয়ে তাতে এতটা চাল রাখ যাতে তুলাদণ্ড আবার অনুভূমিক হয়। এই চালের পরিমাণ এক কিলোগ্রাম কারণ এক কিলোগ্রাম বাটখারা যতটা বলের দ্বারা তুলাপাত্রকে নিচের দিকে টেনেছে এই চালও ঠিক ততটা বলের দ্বারা পাত্রকে নিচের দিকে টানে।

বলের ওজন বার করতে হলে বলের চেয়ে ভারী কোন বস্তুকে বাঁ দিকের তুলাপাত্রে বসাও। ডান পাত্রে এতটা ওজনের বাটখারা রাখ যাতে তুলাদণ্ড অনুভূমিক থাকে। এবার ডানপাত্রে বলটা বসাও, ডানপাত্র নিচে নেমে যাবে। এখন ডানপাত্র থেকে এতটা ওজন নামিয়ে নাও যাতে তুলাদণ্ড আবার অনুভূমিক হয়। তাহলে ডানপাত্র থেকে যতটা ওজন কমালে সেটাই হল বলের ওজন। কারণ আগের মতই।

১৩। সবচেয়ে বেশী কত ওজন তুলতে পারবে ?

তোমার যা ওজন সর্বাধিক তত ওজন তুলতে পারবে।

কারণ পুলির সাহায্যে কোন বস্তুকে উপরে তুলতে হলে দড়িকে নিচের দিকে টানতে হবে আর তোমার নিজের যা ওজন তার চেয়ে বেশী বলের দ্বারা কোন কিছুকে নিচের দিকে টানা সম্ভব নয়।

১৪। কোন্‌টা বেশী কাদায় ডুবে যাবে ?

হাতী অনেক বেশী কাদায় ডুবে যাবে।

কেন বুঝতে হলে ওজন ও চাপের পার্থক্য জানতে হবে। কোন বস্তু নিচের দিকে মোট যতটা বল প্রয়োগ করে সেটা তার ওজন আর প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার বা বর্গ ইঞ্চিতে যতটা বল প্রয়োগ করে সেটা তার চাপ। হাতী ও ট্যাঙ্কের ওজন সমান কিন্তু ট্যাঙ্কের নিম্নতলের ক্ষেত্রফল হাতীর চার পায়ের নিম্নতলের মোট ক্ষেত্রফলের চেয়ে অনেক বেশী। ফলে হাতীর পা মাটিতে অনেক বেশী চাপ দেয় আর কাদায় বেশী ডুবে যায়।

সেফ্টি রেজারে দাড়ি কাটার সময় হাত রেজারে সামান্য বল প্রয়োগ করে কিন্তু সেই একই বল ব্লেডের সূক্ষ্ম কিনারে কাজ করার ফলে সেখানে চাপ দাঁড়ায় প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে বেশ কিছু কিলোগ্রাম আর এতেই দাড়ি কেটে যায়।

সূচে সেলাই করার সময়ও একই ভাবে সূচের সূক্ষ্মাগ্রে প্রচণ্ড চাপ প্রযুক্ত হয়।

১৫। খাঁচার ওজন কত হবে?

তারের খাঁচার বেলা ওজন হবে পাঁচ কিলোগ্রাম কিন্তু কাচের খাঁচার ক্ষেত্রে ওজন হবে ছয় কিলোগ্রাম।

পাখীটাকে খাঁচার ভিতরে ভেসে থাকার জন্য বাতাসের উপর নিচের দিকে নিজের সমান ওজনের অর্থাৎ এক কিলোগ্রাম বল প্রয়োগ করতে হয়। নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী বাতাসও পাখীর উপর সমান অর্থাৎ এক কিলোগ্রাম বল প্রয়োগ করে উপর দিকে, এতেই পাখীটা বাতাসে ভেসে থাকতে পারে।

খাঁচা কাচের হলে পাখী নিচের দিকে যে এক কিলোগ্রাম বল প্রয়োগ করে তা বাতাসের মধ্য দিয়ে খাঁচার নিচের দিকের কাচের উপর প্রযুক্ত হয়। ফলে খাঁচার ওজন হয় ৫ + ১ বা ৬ কিলোগ্রাম।

কিন্তু খাঁচা তারের হলে এই এক কিলোগ্রাম বল বাতাসের মধ্য দিয়ে খাঁচার নিচের মাটিতে কাজ করে ফলে খাঁচার ওজন পাঁচ কিলোগ্রামই থাকে।

১৬। জলের তল কি একই থাকবে?

জলের তল একই থাকবে।

বরফের ভর m হলে আর্কিমিডিসের সূত্র থেকে পাওয়া যায় বরফের জলে নিমজ্জিত অংশের সমায়তন জলের ভরও m। সুতরাং বরফ গলে উৎপন্ন m ভরের জলের আয়তন বরফের নিমজ্জিত অংশের আয়তনের সমান বলে এই জল বরফের নিমজ্জিত অংশের স্থান দখল করে। ফলে গ্লাসের জলতলের কোন পরিবর্তন হয় না।

গ্লাসে জলের চেয়ে বেশী ঘনত্বের তরল থাকলে আগের মতই বরফের ভর বরফের নিমজ্জিত অংশের সমায়তন তরলের ভরের সমান। সুতরাং বরফ গলে উৎপন্ন জলের ভরও বরফের নিমজ্জিত অংশের সমায়তন তরলের ভরের সমান। তাহলে তরল জলের চেয়ে ভারী হলে বরফ গলে উৎপন্ন জলের আয়তন বরফের নিমজ্জিত অংশের আয়তনের চেয়ে বেশী। সুতরাং এক্ষেত্রে জলতল উপরে উঠবে।

আর যদি সে জলের চেয়ে কম ঘনত্বের তরল থাকলে বরফ গলে উৎপন্ন জলের আয়তন বরফের যত অংশ তরলের নিচে আছে সেই আয়তনের চেয়ে কম হবে। ফলে এক্ষেত্রে জলের তল নিচে নামবে।

আবার বরফের টুকরোটা কোনো ভারী জিনিষের সঙ্গে বেঁধে জলের নিচে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে রাখলে বরফ গলনের ফলে জলের তল নিচে নেমে যেত। কারণ জলের ঘনত্ব বরফের চেয়ে বেশী বলে বরফ গলে জলে পরিণত হলে আয়তন কমে যায়।

মনে রেখ বরফের আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৯২ বলে জলে ভাসমান বরফের ৯২% জলের নিচে ডোবা থাকে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বরফের এক দশমাংশ জলের উপরে থাকে আর $\frac{9}{10}$ অংশ জলের ভেতরে থাকে।

১৭। সব গভীরতাতেই কি সমান বল লাগবে?

যত নিচে ডোবানো হবে বল তত কম লাগবে।

গভীরতা বৃদ্ধি পেলে তরলের চাপও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং টেস্ট টিউবকে যত নিচে ডোবানো হয় টেস্ট টিউবের বাতাসের উপর জলের উর্দ্ধচাপও তত বৃদ্ধি পায়। ফলে এই বাতাস সঙ্কুচিত হয়ে টেস্ট টিউবের ভিতর ক্রমশঃ জল প্রবেশ করে। টেস্ট টিউবের ভিতরের বাতাসের আয়তন কমে যাওয়ায় জলের প্লবতাও কমে যায় ফলে টেস্ট টিউবকে ডুবিয়ে রাখার জন্য নিচের দিকে কম বল প্রয়োগ করতে হয়।

১৮। জলের তল কি পরিবর্তিত হবে?

বায়ু (বা কাঠ) থাকলে জলতল একই থাকবে, আর লোহা থাকলে জলতল নেমে যাবে।

প্রথম ক্ষেত্রে বরফ ও বায়ুর মোট ওজন বরফের যত অংশ জলের নিচে আছে তত আয়তন জলের ওজনের সমান। বুদবুদের বায়ুর ওজন শূন্য ধরলে ·৬ নম্বর প্রশ্নের মতই জলতল অপরিবর্তিত থাকে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাঠটা বরফ থেকে বার করে নিলেও কাঠ ও বরফ দুই-ই জলে ভাসে। ফলে জলতলের কোন পরিবর্তন হয় না। আবার বরফ গলে গেলেও জলতলের কোন পরিবর্তন হয় না (·৬ নম্বর প্রশ্ন)। সুতরাং শেষ পর্যন্ত জলতল একই থাকে।

তৃতীয় ক্ষেত্রে মনে কর লোহার ভর w_1 গ্রাম এবং লোহা বাদে বরফের

ভর w_2 গ্রাম, তাহলে মোট ভর (w_1+w_2) গ্রাম। সুতরাং অপসারিত জলের ভরও (w_1+w_2) গ্রাম এবং এই জলের আয়তন (w_1+w_2) মিলিলিটার।

এখন বরফ গলে যে জল উৎপন্ন হয় তার ভর w_2 গ্রাম এবং আয়তন w_2 মিলিলিটার। আবার লোহার আপেক্ষিক গুরুত্ব 7·8 হলে w_1 গ্রাম লোহার আয়তন $\frac{w_1}{7\cdot8}$ মিলিলিটার। সুতরাং বরফ গলার পর লোহা ডুবে গেলে তা $\frac{w_1}{7\cdot8}$ মিলিলিটার জল অপসারিত করে। তাহলে মোট অপসারিত জলের আয়তন $\left(\frac{w_1}{7\cdot8}+w_2\right)$ মিলিলিটার। এটা ভাসার সময়ের অপসারিত জলের আয়তনের চেয়ে কম। সুতরাং জলতল নিচে নেমে যাবে।

১৯। বরফ কোথায় রাখবে?

বোতলের উপরে বরফ রাখতে হবে।

কোন জিনিষ ঠাণ্ডা হলে আয়তনে কমার ফলে তার ঘনত্ব বেড়ে যায়। বোতলের উপর বরফ রাখলে উপরের জল বরফের সংস্পর্শে থাকায় ঠাণ্ডা হয়ে ভারী হয়। ফলে এই জল নিচে নেমে যায় আর নিচ থেকে গরম হালকা জল উপরে উঠে আসে। ক্রমাগত এরকম হওয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যে সব জল ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে।

বোতলের নীচে বরফ রাখলে নিচের জল ঠাণ্ডা হয়ে ভারী হয়। ফলে এই ঠাণ্ডা জল নিচেই থেকে যায় আর উপরের গরম জল নিচে নেমে বরফের সংস্পর্শে এসে ঠাণ্ডা হওয়ার সুযোগ পায় না। অনুরূপ কারণে একপাত্র জল গরম করতে হলে নিচ থেকেই তাপ দিতে হবে, উপর থেকে নয়।

২০। গরম লাগে না কেন?

প্রথমে ডিমটা ভিজা থাকে। আর এই জল বাষ্পীভূত হওয়ার সময় চারপাশ থেকে প্রয়োজনীয় লীন তাপ সংগ্রহ করে, ফলে হাতে গরম লাগে না।

কিন্তু একটু পরেই জল শুকিয়ে গেলে আর জল বাষ্পীভূত হতে পারে না বলে হাতে গরম অনুভূত হয়।

২১। জল কি করে আগুন নেভায়?

প্রথমত জল গরম জিনিষের সংস্পর্শে এসে বাষ্পে পরিণত হয় আর এর জন্য প্রয়োজনীয় লীন তাপ গরম বস্তু থেকে সংগ্রহ করে। এতে প্রচুর তাপ শোষিত

হয় আর চারপাশের উষ্ণতা অনেক কমে যায়। উষ্ণতা কমে যাওয়ার ফলে জলন্ত বস্তু আর আগের মত তীব্রভাবে জ্বলতে পারে না। মনে রাখবে ১০০° সেলসিয়াস উষ্ণতার এক গ্রাম জলকে একই উষ্ণতায় বাষ্পে পরিণত করতে ৫৩৭ ক্যালরি তাপ প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত জল থেকে যে বাষ্প উৎপন্ন হয় তার আয়তন জলের আয়তনের কয়েক শ' গুণ। এই বাষ্প জ্বলন্ত বস্তুকে ঘিরে ফেলায় অক্সিজেনের অভাবে আগুন নিভে যায়।

আশ্চর্য মনে হলেও অনেক সময় আগুন নেভাতে জলে বারুদ মেশানো হয়। কারণ বারুদ দ্রুত পুড়ে গিয়ে প্রচুর অদাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয় যা জ্বলন্ত বস্তুকে বাতাসের সংস্পর্শে আসতে দেয় না।

২২। শিখা নিজে থেকে নিভে যায় না কেন?

আগুন জ্বলার ফলে যে সব অদাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয় তা গরম হয়ে আয়তনে প্রসারিত হয়। ফলে তা হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় এবং চারপাশের অক্সিজেনপূর্ণ ঠাণ্ডা ভারী বাতাস আগুনের কাছে চলে আসে। সুতরাং শিখাও নেভে না।

অভিকর্ষ না থাকলে অদাহ্য গ্যাসগুলো উপরে না উঠে শিখাকে ঘিরে থাকত ফলে আগুনও অল্পক্ষণের মধ্যেই নিভে যেত।

২৩। চুম্বকের কি হবে?

না, ঘর্ষণকারী চুম্বকের ক্ষমতা বা দৈর্ঘ্য কমে যায় না।

সাধারণ লোহার প্রত্যেকটি অণুই একটি ক্ষুদ্র চুম্বক। সাধারণ অবস্থায় এই অণু চুম্বকগুলি (বিজ্ঞানী ওয়েবারের নামানুযায়ী যাদের বলা হয় ওয়েবার উপাদান, Weber element) বদ্ধ শৃঙ্খলের আকারে সাজানো থাকে। ঘর্ষণের সময় ঘর্ষণের যান্ত্রিক শক্তি এই ওয়েবার উপাদানগুলিকে মুক্ত শৃঙ্খলের আকারে সজ্জিত করে যাতে একদিকে থাকে অণু চুম্বকগুলির শুধু উত্তর মেরু আর অন্য দিকে থাকে শুধু দক্ষিণ মেরু। এতে লোহার দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হয়। এখানে যান্ত্রিক শক্তিই চৌম্বক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

২৪। কোন্‌টি বেশী ভারী?

বায়ুশূন্য স্থানে এক টন জলই বেশী ভারী।

সোনা জলের চেয়ে উনিশগুণ ভারী, সুতরাং জলের আয়তন সম ওজনের সোনার আয়তনের উনিশ গুন। তাহলে বাতাসের প্রবতা জলের ক্ষেত্রে সোনার ক্ষেত্রের উনিশ গুন। এখন বাতাসে উভয়েরই ওজন সমান। তাহলে এক টন জলের প্রকৃত ওজন – জলের ক্ষেত্রে প্রবতা = এক টন সোনার প্রকৃত ওজন – সোনার ক্ষেত্রে প্রবতা।

অর্থাৎ এক টন জলের প্রকৃত ওজন = এক টন সোনার প্রকৃত ওজন + জলের ক্ষেত্রে প্রবতা – সোনার ক্ষেত্রে প্রবতা।

এখন জলের ক্ষেত্রে প্রবতা বেশী বলে এক টন জলের প্রকৃত ওজন এক টন সোনার প্রকৃত ওজনের চেয়ে বেশী।

২৫। এতটুকু রিং-এর ভিতর দিয়ে এত বড় জুতো গললো কি করে?

ফ্রেমটা হ'ভাঁজ কর, একটা ভাঁজের অগ্রভাগ দিয়ে রিংটা ভিতরে ঢুকিয়ে দাও। এবার একটা জুতো এই ভাঁজের ভিতর দিয়ে নীচে গলিয়ে দাও, অন্য জুতোটা ভাঁজের বাইরে দিয়ে নিচে ঝুলিয়ে রাখ। এবার জুতোজোড়া ভাঁজের



চিত্র 2 (উত্তর 25)

অগ্রভাগে নিয়ে এসো। সবশেষে রিংটাকে ভাঁজের অগ্রভাগে নিয়ে এসে জুতোজোড়া যুক্তকারী কাগজের ফালির উপর দিয়ে নিচে গলিয়ে ফ্রেমের ভাঁজ খুলে ফেল (চিত্র ২)

২৬। রিং এ বল পরাওতো দেখি !

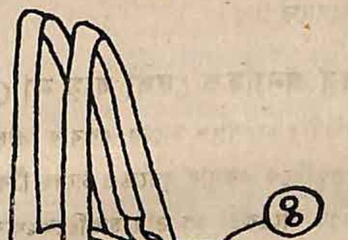
পচিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের অনুসরণে কর (চিত্র ৩)।



চিত্র 3 (উত্তর 26)

২৭। বোতাম খুলতে পারবে ?

লম্বা কাগজটা দুভাঁজ কর। দুটো কাটার মাঝখানের সরু কাগজের ফালি ডিম্বাকার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বাইরে বার করে নিয়ে এসো। এখন সুতো



চিত্র 4 (উত্তর 27)

বাঁধা বোতাম দুটো সরু কাগজের ফালির ফাঁসের (loop) ভিতর দিয়ে বার করে নাও (চিত্র ৪)।

২৮। কোন্‌টি আগে পড়বে ?

নিরেট গোলক আগে পড়বে।

মনে কর নিরেট ও ফাঁপা গোলকের ভর যথাক্রমে M ও m, তাহলে

$M > m$। উভয় গোলকের ব্যাসার্ধ সমান বলে বায়ুর বাধাও সমান। মনে কর বায়ুর বাধা R।

নিরেট ও ফাঁপা গোলকের ওজন যথাক্রমে Mg ও mg, সুতরাং তাদের উপর নিম্নমুখী বল যথাক্রমে $Mg - R$ ও $mg - R$, তাহলে তাদের নিম্নমুখী ত্বরণ যথাক্রমে

$$\frac{Mg-R}{M} \text{ বা } g-\frac{R}{M} \text{ ও } \frac{mg-R}{m} \text{ বা } g-\frac{R}{m}$$

এখন $M > m$, সুতরাং $\frac{R}{M} < \frac{R}{m}$

তাহলে $g-\frac{R}{M} > g-\frac{R}{m}$, অর্থাৎ নিরেট গোলকের ত্বরণ বেশী সুতরাং এটা আগে পড়বে।

২৯। নৌকার কি হবে ?

নৌকার উপর দিয়ে সামনের দিকে এগোতে হলে পা দিয়ে নৌকাকে পিছন দিকে ঠেলতে হবে। ফলে নৌকা পিছন দিকে সরে যায় আর নিউটনের তৃতীয় গতি সূত্রানুযায়ী নৌকা তোমার উপর সামনের দিকে যে বল প্রয়োগ করে তাতেই তুমি সামনের দিকে এগোতে পার।

৩০। চাঁদের অন্যদিক দেখা যায় না কেন ?

এর কারণ হল পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের একবার প্রদক্ষিণ করতে যে সময় লাগে নিজের অক্ষের চতুর্দিকে একবার ঘুরতেও চাঁদের ঠিক একই সময় লাগে। একটা বলকে স্থির রেখে আরেকটা বল তার চারদিকে ঘোরালে ব্যাপারটা সহজেই বুঝতে পারবে।

৩১। উপগ্রহের ভিতরে ভারশূন্য মনে হয় কেন ?

পৃথিবীর চতুর্দিকে যখন কোন কৃত্রিম উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করে তখন পৃথিবীর অভিকর্ষ উপগ্রহের প্রদক্ষিণের জন্য প্রয়োজনীয় সেন্ট্রিপেটাল বল যোগাতেই খরচ হয়ে যায়। অর্থাৎ উপগ্রহ ও ভিতরের মানুষ বাধাহীন ভাবে পতনশীল বস্তুর মত আচরণ করে। এর জন্যই সবকিছুকে ভারশূন্য মনে হয়।

অবশ্য চাঁদে কোন কিছুকে ভারশূন্য মনে হয় না কারণ চাঁদের নিজস্ব আকর্ষণ আছে ; কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ খুব ছোট বলে তার নিজস্ব আকর্ষণ শূন্য বলে ধরা যেতে পারে, পরীক্ষা ৮৮ দেখ।

প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহে বা বাধাহীনভাবে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে অভিকর্ষের প্রভাব নেই বলে আর্কিমিডিসের সূত্র প্রযোজ্য হয় না।

৩২। তেলের আগুন কি জল ঢেলে নেভানো যায়?

তেলের আগুন জল ঢেলে নেভানো যায় না, কারণ, তেল জলের চেয়ে হালকা। সুতরাং তেল উপরে ভেসে ওঠে, ফলে জল তেলকে বাতাসের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

৩৩। বাঁশির সুরের তীক্ষ্ণতা।

বাতাসের উষ্ণতা বা আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে বাঁশির সুরের তীক্ষ্ণতাও বৃদ্ধি পায়।

বাতাসের উষ্ণতা বা আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে শব্দের গতিবেগও বৃদ্ধি পায়। প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বায়ুতে শব্দের গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় দু' ফুট হিসাবে বৃদ্ধি পায়।

কোন বাঁশিতে যে সব সুর উৎপন্ন হয় তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট থাকে আর তা নির্ভর করে বাঁশির গঠনের উপর। আবার কম্পাঙ্ক = শব্দের গতিবেগ/তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে গতিবেগ বৃদ্ধি পেলে শব্দের কম্পাঙ্কও বৃদ্ধি পায়। কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পেলে সুরও তীক্ষ্ণ হয়।

৩৪। লোকভর্তি ঘরের শব্দ ক্ষীণ হয় কেন?

লোকভর্তি হলঘরে শব্দ ক্ষীণ হয় কারণ লোকের দেহ শব্দতরঙ্গ শোষণ করে নেয়।

৩৫। বজ্রপাতের সময় কি করা উচিত?

যে জায়গা যত উঁচু সেখানে বজ্রপাতের সম্ভাবনা তত বেশী। সুতরাং বজ্রপাতের সময় কোন গাছের নিচে থাকা বা খোলা মাঠে দাঁড়ানো উচিত নয়, তখন খোলা মাঠে শুয়ে থাকাই ঠিক।

৩৬। বৈদ্যুতিক হিটার।

কোন পরিবাহীতে প্রবাহের মাত্র C এবং পরিবাহীর রোধ R হলে t সময়ে পরিবাহীতে যে তাপ উৎপন্ন হবে তার মান $H = 0{\cdot}24\ C^2Rt$।

হিটারের তারের রোধ তামার তারের রোধের চেয়ে অনেক বেশী বলে উভয় তারে বিদ্যুৎপ্রবাহের মাত্রা সমান হলেও হিটারের তারে অনেক বেশী তাপ উৎপন্ন হয়; ফলে তা অনেক বেশী গরম হয়।

৩৭। ইলেকট্রিক বাল্বের রোধ।

কোন পরিবাহীর রোধ R এবং পরিবাহীর উভয় প্রান্তের বিভব পার্থক্য E হলে t সময়ে পরিবাহীতে যে শক্তি ব্যয় হয় তার পরিমাণ $\frac{E^2t}{R}$।

একটি ১০০ ওয়াটের বাল্বের তুলনায় একটি ২০০ ওয়াটের বাল্বে প্রতি সেকেণ্ডে দ্বিগুন শক্তি ব্যয় হয়। সুতরাং উভয় বাল্বেই দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য সমান বলে ২০০ ওয়াটের বাল্বের রোধ ১০০ ওয়াটের বাল্বের রোধের অর্ধেক।

৩৮। ধনাত্মক আয়ন সহজে চলাচল করে না কেন?

ইলেকট্রন ধনাত্মক আয়নের তুলনায় খুব হালকা বলে এর স্থিতি জাড্য অনেক কম। এইহেতু ইলেকট্রন সহজে চলাচল করতে পারে।

৩৯। তড়িৎ প্রবাহ

ইলেকট্রন, কোন তড়িংযুক্ত কণা বা যে কোন ঋনাত্মক আয়ন বা যে কোন ধনাত্মক আয়নের গতিই বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে।

৪০। ফ্রিজ ও ঘরের উষ্ণতা

ঘরে ফ্রিজ চালু থাকলে ঘরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

ফ্রিজের মেশিনের কাজ হল ভিতর থেকে তাপ বাইরে বার করে দেওয়া। ফলে ফ্রিজের ভিতরটা ঠাণ্ডা থাকে কিন্তু ঘর গরম হয়। তাপ গতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র (Second law of Thermodynamics) অনুযায়ী তাপ কখনও নিজে থেকে ঠাণ্ডা বস্তু থেকে গরম বস্তুতে যেতে পারে না। সেইজন্য শীতল ফ্রিজ থেকে গরম ঘরে তাপ সঞ্চালনের জন্য শক্তি খরচ করতে হয় আর এই শক্তি আসে বিদ্যুৎ প্রবাহ থেকে।

৪১। নীল চশমা ও গাছের পাতা

নীল চশমা দিয়ে সবুজ পাতা লাল দেখায়।

গাছের সবুজ পাতা সবুজের সঙ্গে কিছু লাল রংও প্রতিফলিত করে আর অন্য সব রং শোষণ করে। আবার নীল কাচের মধ্য দিয়ে নীলের সঙ্গে সঙ্গে কিছু লাল রংও যেতে পারে, অন্য সব রং নীল কাচ শোষণ করে নেয়।

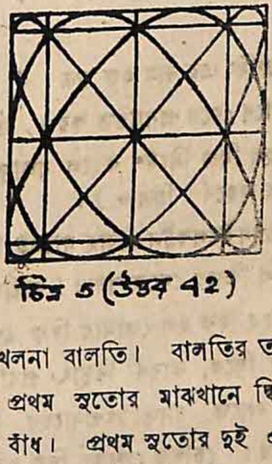
সুতরাং দেখা যাচ্ছে সবুজ পাতার সবুজ রং নীল চশমা শোষণ করে কিন্তু পাতা থেকে আসা লাল রংকে চোখে যেতে দেয়। ফলে পাতা লালচে মনে হয়। একই কারণে নীল বাল্বের আলোয় সবুজ পাতা লাল দেখায়।

৪২। লিসাজো চিত্র কাকে বলে ?

একটি সুতোর এক প্রান্তে একটি ভারী ছোট বস্তু বাঁধলে একটি সরল দোলক প্রস্তুত হয়—যেমন ঘড়ির পেণ্ডুলাম। ভারী বস্তুটিকে বলে বব (Bob)।

সুতোর অন্যপ্রান্ত কোন আংটা থেকে ঝুলিয়ে ববকে একপাশে একটু টেনে ছেড়ে দিলে দোলক দুলতে সুরু করে। সরল দোলকের গতিকে বলে সরল সমঞ্জস গতি। সরল দোলক একই সমতলে দোলে অর্থাৎ বব একই বৃত্তচাপে বারবার চলাচল করে।

কিন্তু কোন বস্তুর উপর দুইটি সরল সমঞ্জস গতি বা দোলন (oscillation) লম্বভাবে কাজ করলে বস্তুটি একই বৃত্তচাপে না চলে বিভিন্ন পথে চলতে থাকে। এই ধরনের পথকেই বলে লিসাজো চিত্র (Lissajous figure)। কারণ ফরাসী বিজ্ঞানী লিসাজো 1863 সালে সর্বপ্রথম এই ধরনের চিত্রের কথা বলেন (চিত্র ৫)। লিসাজো চিত্রের আকার বিভিন্ন রকম হতে পারে।



চিত্র 5 (উত্তর 42)

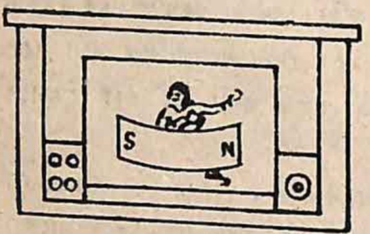
তোমরা নিজেরাই লিসাজো চিত্র তৈরি করতে পার। এর জন্য এমন একটি দোলক বানাও যার বব একটি ছোট খেলনা বালতি। বালতির তলায় একটি ছিদ্র থাকবে। এবার দুটো সুতো নাও, প্রথম সুতোর মাঝখানে দ্বিতীয় সুতো বাঁধ। প্রথম সুতোর দুই প্রান্ত দরজার উপরের চৌকাঠের নিচে দুটো বিন্দুতে আটকে দাও। দ্বিতীয় সুতোর অন্যপ্রান্তে বালতিটি বেঁধে তা বালিতে ভর্তি কর (চিত্র ৬)। বালতিটি প্রথম সুতোর দুই প্রান্ত সংযোগকারী সরল-রেখার সঙ্গে লম্বভাবে কিছুটা টেনে ছেড়ে দাও। বালতিটির কিছু নিচে একটি টেবিল রেখে তাতে একটি সাদা কাগজ রাখ। বালতিটির দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কাগজে বালি পড়ে একটি লিসাজো চিত্র তৈরি হবে।



চিত্র 6 (উত্তর 42)

৪৩। টিভির সাহায্যে চুম্বকের মেরু নির্ণয়।

একটি চালু টেলিভিসনের সামনে চুম্বকটিকে চিত্র 7 এর মত ধর। সঙ্গে সঙ্গে টিভির ছবি উপরে বা নিচে সরে যাবে। টিভির ভিতরের পিকচার টিউব থেকে পর্দার দিকে ইলেকট্রন প্রবাহের ফলেই টিভির পর্দায় ছবি ফুটে ওঠে। চুম্বক ধরার ফলে এই ইলেকট্রনগুলি উপরে বা নিচে বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে ছবিও যথাক্রমে উপরে বা নীচে সরে যায়। এখন ফ্লেমিং এর বাম হস্ত নিয়মের সাহায্যে চুম্বকের মেরু নির্ণয় করা যায়।

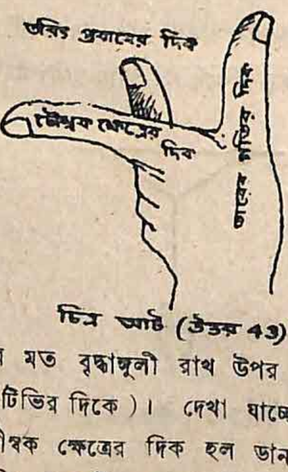


চিত্র 7 (উত্তর 43)

ফ্লেমিং এর বাম হস্ত সূত্র : বাঁ হাতের প্রথম তিনটি আঙুল পরস্পরের সঙ্গে সমকোণে রেখে প্রসারিত কর। তর্জনী চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক এবং মধ্যমা তড়িৎ প্রবাহের দিক নির্দেশ করলে বৃদ্ধাঙ্গুলী বিদ্যুৎবাহী তারের সরে যাওয়ার দিক নির্দেশ করবে (চিত্র ৮)।

এখন ইলেকট্রন প্রবাহ মানেই বিদ্যুৎ প্রবাহ, কিন্তু ঋনাত্মক তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রনগুলি ভিতর থেকে পর্দার (অর্থাৎ তোমার) দিকে আসছে। তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক হল তোমার দিক থেকে টিভির দিকে, কারণ বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক বলতে ধনতড়িৎপ্রবাহের দিক বোঝায়। চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক বলতে বোঝায় উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর দিক।

মনে কর টিভির ছবি উপর দিকে সরে গেল। অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলি উপর দিকে বিক্ষিপ্ত হল। তাহলে ৮ নং চিত্রের মত বৃদ্ধাঙ্গুলী রাখ উপর দিকে, মধ্যমা রাখ তোমার সামনের দিকে (অর্থাৎ টিভির দিকে)। দেখা যাচ্ছে এই অবস্থায় তর্জনী থাকছে বাঁ দিকে অর্থাৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক হল ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। সুতরাং অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকটির ডান দিকের মেরু উত্তর মেরু।



চিত্র আট (উত্তর 43)

৪৪। অণু পরমাণু ইত্যাদির ব্যাস কত ?

এগুলি সাধারণতঃ অ্যাঙ্গস্ট্রম (Angstrom) এককে বা মিলিমাইক্রনে প্রকাশ করা হয়।

এক সেন্টিমিটার $=10^8$ অ্যাঙ্গস্ট্রম (A)

$=10^7$ মিলিমাইক্রন ($m\mu$)

$=10^4$ মাইক্রন ($\mu=$ মিউ)

সুতরাং এক মাইক্রন $=1000$ মিলি মাইক্রন $=10000$ অ্যাঙ্গস্ট্রম।

আবার এক মিলি মাইক্রন $=10$ A

নিচে অণু পরমাণু ইত্যাদির ব্যাস দেওয়া হল।

কণা	ব্যাস
1 সাধারণ পরমাণু	1 থেকে 5A
2. সাধারণ অণু	1 থেকে 10 A
3. সেলুলোজ অণু	$15-100m\mu$
4. কলয়ড কণা	$2-100m\mu$
5 অণুবীক্ষণে দেখার সীমা	প্রায় 250 $m\mu$
6. ভাইরাস	$50-300$ $m\mu$
7. ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস	100 $m\mu$
8. জীবাণু	প্রায় 750 $m\mu$
9. রক্তের লোহিত কণিকা	$5{\cdot}5-8{\cdot}8$ μ
10. রক্তের শ্বেত কণিকা	$7{\cdot}5-12$ μ

৪৫। আকাশ কেন নীল ?

বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন ধূলিকণা, জলকণা এবং বাতাসের বিভিন্ন গ্যাসের অণুর দ্বারা সূর্যের আলোর বিক্ষেপনের জন্যই আকাশ নীল দেখায়। আলোর খেলা, পরীক্ষা 78 দেখ।

বায়ুতে সূর্যের সাদা আলোর বিক্ষেপণের পর বিক্ষিপ্ত আলোতে বেগুনী, আসমানী ওনীল রঙের প্রাবল্য অনেকবেশী থাকে। ফলে আকাশ নীল মনে হয়। বায়ুমণ্ডল না থাকলে আকাশ নীল দেখাত না, কাল দেখাত এবং দিনের বেলাও

নক্ষত্রগুলি দেখা যেত। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে যেখানে বায়ু খুব কম বলে বিক্ষেপণ খুব সামান্য সেখানে আকাশ কাল মনে হয়।

৪৬। সমুদ্র কেন নীল?

অনুরূপভাবে সমুদ্রের জলের অণুর দ্বারা সূর্যের সাদা আলোর বিক্ষেপণের ফলেই সমুদ্রের জল নীল দেখায়।

প্লেন থেকে দিগন্তের কাছাকাছি সমুদ্রের জলের চেয়ে ঠিক নিচের জল বেশী গাঢ় মনে হয়। এর কারণ হল বিকিরণের ক্ষেত্রে আপতন কোণ যত কম হয় আলোকের শোষণ তত বেশী হয়। প্লেন থেকে নিচের দিকে তাকালে দিগন্তের কাছাকাছি সমুদ্রের অংশ থেকে বড় কোণে আপতিত রশ্মি প্রতিফলনের পর দর্শকের চোখে এসে পৌছায়। এই ক্ষেত্রে সমুদ্রের জল কম আলো শোষণ করে, ফলে তা উজ্জ্বল লাগে।

অপরপক্ষে ঠিক নিচের জল থেকে ক্ষুদ্রকোণে আপতিত রশ্মি প্রতিফলনের পর দর্শকের চোখে পৌছায়। এক্ষেত্রে জল বেশী আলো শোষণ করে, ফলে ঠিক নিচের সমুদ্রের জল গাঢ় মনে হয়।

৪৭। ভোর এবং সন্ধ্যার সূর্য লাল কেন?

ভোরে ও সন্ধ্যায় সূর্য দিগন্তের কাছে থাকে বলে সূর্যরশ্মিকে গভীর বায়ুস্তর ভেদ করে পৃথিবীতে এসে পৌছাতে হয়। এতে দুপুরের তুলনায় সূর্যরশ্মি অনেক বেশী বিক্ষিপ্ত হয়। আবার আগেই দেখেছ (পরীক্ষা 78) নীল প্রান্তের বর্ণগুলির লাল প্রান্তের বর্ণগুলির তুলনায় বেশী বিক্ষেপণ হয়।

ফলে নীল প্রান্তের বর্ণগুলি বেশী বিক্ষিপ্ত হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পরে, সোজাসুজি আমাদের চোখে আসতে পারে না। অপরপক্ষে লাল প্রান্তের বর্ণগুলি কম বিক্ষিপ্ত হয় বলে বেশীর ভাগই সূর্য থেকে সোজাসুজি আমাদের চোখে এসে পৌছায়। এজন্যই ভোরে ও সন্ধ্যায় সূর্যকে লাল মনে হয়।

আর দুপুরের দিকে সূর্যরশ্মির বিক্ষেপ কম হয় বলে সূর্য থেকে সোজাসুজি যে আলো আমাদের চোখে আসে তাতে নীল প্রান্তের বর্ণগুলি খুব একটা কম থাকে না, ফলে সূর্যকে সাদা দেখায়।

৪৮। ইলেকট্রনের গতিবেগ কত?

আমরা সাধারণতঃ মনে করি বিদ্যুতের বেগ আলোকের বেগের সমান অর্থাৎ সেকেণ্ডে 186171 মাইল বা 299793 কিলোমিটার (শূন্য মাধ্যমে)। এটা

সত্যি হবে যদি বিদ্যুৎ বলতে বেতার তরঙ্গ (যার মধ্যেমে রেডিও বা টিভি স্টেশন থেকে বাড়ির রেডিও বা টিভি সেটে শব্দ বা ছবি প্রেরণ করা হয়) বোঝায়।

কিন্তু বিদ্যুতের বেগ বলতে বিদ্যুৎবাহী তারে ইলেকট্রনের বেগ বোঝালে তা হবে খুব কম। এই বেগ তারের উপাদান, তারের উভয়প্রান্তের বিভব পার্থক্য ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় সাধারণ বিদ্যুৎবাহী তারের ইলেকট্রনের গতিবেগ সেকেণ্ডে দু'এক সেন্টিমিটার মাত্র।

তাছাড়া একটি ইলেকট্রনই যে তারের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত যায়, তাও নয়, একটি ইলেকট্রন কিছুটা যায়, অন্য একটি ইলেকট্রন আবার কিছুটা যায়, এইভাবেই বিদ্যুৎ প্রবাহ বজায় থাকে।

৪৯। চাঁদকে দিনে সাদা কিন্তু রাত্রে হলদে দেখায় কেন?

চাঁদ সূর্যের সাদা আলোর হলুদ বর্ণকে প্রতিফলিত করে। এইজন্য রাত্রে চাঁদকে হলদে দেখায়। কিন্তু দিনে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দ্বারা বিক্ষিপ্ত নীল রং চাঁদের হলুদ বর্ণের সঙ্গে মেশার ফলে চাঁদকে সাদা মনে হয়।

৫০। পরিপূরক বর্ণ কাকে বলে?

যদি দুইটি বর্ণ মিলে সাদা আলোর অনুভূতি সৃষ্টি করে তবে এদের একটিকে অন্যের পরিপূরক বর্ণ বলে। নিচে পরিপূরক বর্ণের তালিকা দেওয়া হল।

বর্ণ	বেগুনী	নীল	আসমানী	সবুজ	হলুদ	কমলা	লাল
পরিপূরক বর্ণ	সবুজাভ হলুদ	হলুদ	কমলা	রক্ত-নীল	নীল	আসমানী	নীলাভ সবুজ

৫১। আলোর এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়া।

আলো যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায় তখন তার গতিবেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয় কিন্তু কম্পাঙ্ক একই থাকে।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী শূন্যে সব রঙের আলোর গতিবেগ একটি মহাজাগতিক ধ্রুবক (universal constant) অর্থাৎ এর মানে

আলোর উৎসের গতিবেগ, দর্শকের গতিবেগ বা অন্য কোন কিছুর উপরই নির্ভর করে না।

৫২। জলের মধ্যে বস্তুর রং।

কোন ব্যক্তি জলে নিমজ্জিত অবস্থাতেও যে কোন বস্তুর স্বাভাবিক রং (অর্থাৎ বাতাসে থাকলে যে রং অনুভব করত) অনুভব করবে। কারণ আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে গেলেও তার কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয় না এবং আলোর বর্ণ নির্ভর করে তার কম্পাঙ্কের উপর।

৫৩। বিভিন্ন রঙের আলোর গতিবেগ কি বিভিন্ন ?

শূন্য মাধ্যমে সব বর্ণের আলোর গতিবেগ সমান। কিন্তু অন্য যে কোন মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের গতিবেগ বিভিন্ন। অন্য মাধ্যমে বেণীআসহকলা (বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল) বর্ণালীর এই সাতটি বর্ণের মধ্যে বেগুনীর বেগ সবচেয়ে কম, তারপর ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে লালের বেগ সবচেয়ে বেশী। যেমন কাচে লাল রঙের বেগ বেগুনী রঙের বেগের প্রায় 1·8 গুণ।

আলো যদি এক মাধ্যম a থেকে অন্য মাধ্যম b তে যায় তাহলে a মাধ্যম সাপেক্ষে b মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক

$$a\mu_b = \frac{a \text{ মাধ্যমে আলোকের গতিবেগ}}{b \text{ মাধ্যমে আলোকের গতিবেগ}}$$

সুতরাং একই মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের বেগ বিভিন্ন বলে বিভিন্ন বর্ণের প্রতিসরাঙ্কও বিভিন্ন প্রত্যেক বর্ণের a মাধ্যম থেকে b মাধ্যমে যাওয়ার ক্ষেত্রে)।

বেগুনীর বেগ সবচেয়ে কম বলে বেগুনীর প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে বেশী আর লালের প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে কম। সুতরাং এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় বেগুনী রশ্মি সর্বাধিক ও লাল রশ্মি সবচেয়ে কম বাঁকে।

বিভিন্ন বর্ণের প্রতিসরাঙ্ক বিভিন্ন হওয়ার জন্যই আলোকের বিচ্ছুরণ (dispersion) ঘটে অর্থাৎ সাদা আলো প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় সাতটি রঙে ভেঙে গিয়ে বর্ণালী সৃষ্টি করে।

৫৪। সূর্য থেকে বিকিরিত শক্তির কত অংশ পৃথিবীতে আসে ?

মোটামুটি ভাবে পৃথিবী সূর্য থেকে নির্গত শক্তির $\frac{1}{225 \times 10^7}$ অংশ পায়।

৫৫। প্রতিপ্রভা, অনুপ্রভা ও তাপাপন

প্রতিপ্রভা: কিছু বস্তু ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে স্বপ্রভ (luminous অর্থাৎ যা থেকে আলো বের হয়) হয় এবং বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করে। একে বলে প্রতিপ্রভা (fluorescence)। ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইডে সর্বপ্রথম প্রতিপ্রভা লক্ষ্য করা হয় বলে একে ফ্লোরেসেন্স বলে। যতক্ষণ আপতিত আলো উপস্থিত থাকে প্রতিপ্রভা শুধু ততক্ষণ থাকে। প্রতিপ্রভা বস্তুর উপরিভাগেই সীমাবদ্ধ থাকে।

কুইনাইন সালফেটের দ্রবণে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি এসে পড়লে প্রতিপ্রভার জন্য ঐ দ্রবণ বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নীল রশ্মি বিকিরণ করে। প্রতিপ্রভার সাহায্যে এইভাবে আলট্রাভায়োলেট রশ্মির উপস্থিতি বোঝা যায়। ইউরেনিয়াম অক্সাইড, বেরিয়াম প্লাটিনো-সায়ানাইড প্রভৃতি প্রতিপ্রভ বস্তুর উদাহরণ।

অনুপ্রভা: কতকগুলি বস্তুকে কিছুক্ষণ আলোয় রেখে পরে অন্ধকারে নিয়ে এলে তারা অন্ধকারেও কিছুসময় আলো দিতে থাকে। এ হল অনুপ্রভা। অনুপ্রভ বস্তুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে অনুপ্রভা কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক ঘণ্টাও থাকতে পারে। উষ্ণতা বাড়লে নির্গত আলোর প্রাবল্য বাড়ে কিন্তু অনুপ্রভার সময় কমে যায়।

ক্যালসিয়াম সালফাইড, বেরিয়াম সালফাইড ইত্যাদি বস্তু অনুপ্রভ। ক্যালসিয়াম সালফাইডের অনুপ্রভা দীর্ঘক্ষণ থাকে। আপতিত আলো বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপ্রভা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু আপতিত আলো অদৃশ্য হওয়ার পরই অনুপ্রভা সুরু হয়। ফসফরাসকে সাধারণ বাতাসে অন্ধকারে রাখলে তা থেকে সবুজাভ সাদা আলো বার হয় (অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগের ফলে), এই ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার জন্য অনুপ্রভাকে ফসফোরেসেন্স (Phosphorescence) বলে। জোনাকি, ঈল ইত্যাদির আলো কিন্তু অনুপ্রভা নয়, এগুলি তাদের নিজস্ব দীপ্তি।

তাপাপন: কিছু বস্তু দীর্ঘ তরঙ্গের বিকিরণ শোষণ করে ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলো বার করে, একে বলে তাপাপন বা ক্যালরিসেন্স (calorescence)। তাপাপন প্রতিপ্রভার বিপরীত।

৫৬। আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্য

সাধারণ আলো, বিকিরিত তাপ, এক্স রশ্মি, বেতার তরঙ্গ ইত্যাদি সব রকম বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গকে (Electromagnetic wave) সাধারণভাবে আলো বা

বিকিরণ বলা হয়। এরমধ্যে সাধারণ আলোকে বলা হয় দেখা আলো আর বাকি সবগুলি হল না দেখা আলো অর্থাৎ তাদের দ্বারা মানুষের চোখ কোন বস্তুকে দেখতে পায় না।

বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ হল তির্যক (transverse) তরঙ্গ অর্থাৎ কণার গতির দিক ও তরঙ্গের গতির দিক পরস্পর লম্ব। পক্ষান্তরে শব্দ তরঙ্গ হল অণুদৈর্ঘ্য (longitudinal) অর্থাৎ কণার গতির দিক ও তরঙ্গের গতির দিক সমান্তরাল।

কোন মাধ্যমে তির্যক বা অণুদৈর্ঘ্য যে কোন তরঙ্গের গতিবেগ V, কম্পাঙ্ক (প্রতি সেকেণ্ডে কম্পনের সংখ্যা) n এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ (ল্যামডা) হলে সবসময় $V = n\lambda$ হবে।

আলোকতরঙ্গের প্রকৃতি নির্ভর করে তার কম্পাঙ্কের উপর। বিভিন্ন মাধ্যমে একই আলোক তরঙ্গের গতিবেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভিন্ন, কিন্তু সব মাধ্যমেই তার কম্পাঙ্ক সমান। নিচে শূন্য মাধ্যমে বিভিন্ন আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য দেওয়া হল। মনে রেখ অন্য মাধ্যমে তরঙ্গদৈর্ঘ্য পালটে যাবে।

রশ্মির নাম	শূন্য মাধ্যমে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য
হার্ড গামা রশ্মি	0·004 A এর কম
গামা রশ্মি	0·004 A—1·4 A
এক্স রশ্মি	0·1 A—1000 A
আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি	136 A—3900 A
দেখা আলো	3900 A—7800 A
ইনফ্রা-রেড বা তাপ তরঙ্গ	7800 A—0·04 সেমি
হার্ট্‌জ তরঙ্গ	0·01 সেমি. – 3×10^6 সেমি.
ছোট হার্ট্‌জ তরঙ্গ	0·01 সেমি. – 1000 সেমি.
বেতার তরঙ্গ	1000 সেমি. – 3×10^6 সেমি.
মন্থর কম্পন (slow oscillations)	3×10^6 সেমির বেশী

তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুসারে এক্স রশ্মিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য—হার্ড, মাঝারি তরঙ্গদৈর্ঘ্য—মাঝারি ও বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য—কোমল। কোন কোন ক্ষেত্রে একই রশ্মিকে দুইটি নামেও অভিহিত করা হয়েছে যেমন 0·1A থেকে 1·4 A তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রশ্মিকে গামা রশ্মিও বলা যায় আবার

এক্স রশ্মিও বলা যায়। নিচে দেখা আলোর বিভিন্ন বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য দেওয়া হল।

বর্ণ	শূন্য মাধ্যমে তরঙ্গদৈর্ঘ্য	বর্ণ	শূন্য মাধ্যমে তরঙ্গদৈর্ঘ্য
বেগুনী	3900—4500 A	হলুদ	5500—5900 A
নীল	4500 – 4800 A	কমলা	5900—6400 A
আসমানী	4800—5000 A	লাল	6400 –7800 A
সবুজ	5000—5500 A		

৫৭। অশান্ত সমুদ্র শান্ত করা।

জলে অন্য কিছু মেশালে জলের তলটান কমে যায়—ঘূর্ণায়মান চক্র, পরীক্ষা 15 দেখ। সুতরাং অশান্ত সমুদ্রে তেল ঢাললে জলের উপরিতলের তলটান অনেক কমে যায়।

বাতাস এই তেলমেশানো উপরিতলকে সামনে ঠেলে দিলে তেল সামনে জড় হয় এবং পরিষ্কার তেলহীন জল পিছনে পড়ে থাকে। ফলে সামনের তেল-মেশানো জলের তলটান কমে যায় এবং পিছনের পরিষ্কার জলের তলটান তার চেয়ে বেশী হয়। পরিষ্কার জলের তলটান বেশী হওয়ায় তা সামনের স্তূপীকৃত তেল মেশানো অংশকে পিছনে টেনে ধরে। ফলে জলের উপর বড় ঢেউ সৃষ্টি হওয়াতে বাধা পড়ে এবং সমুদ্র ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায়।

৫৮। কোথায় চুম্বক উল্লম্ব থাকে ?

পৃথিবীর দুই চুম্বক মেরুতে সব চুম্বক উল্লম্ব হয়ে থাকে। দুই চুম্বক মেরুতে চুম্বকটির ঠিক নিচেই পৃথিবীর এক চুম্বকমেরু থাকায় তার আকর্ষণে চুম্বকটি উল্লম্ব ভাবে থাকে।

পৃথিবীর উত্তর চুম্বকমেরুতে চুম্বকের উত্তর মেরু নিচের দিকে থাকে, কারণ পৃথিবীর উত্তর চুম্বকমেরু প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ চুম্বকমেরু। দক্ষিণ চুম্বকমেরুতে চুম্বকের দক্ষিণমেরু নিচের দিকে থাকে।

৫৯। লঘু পরমাণু ও ভারী পরমাণু।

ভারী পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা বেশী থাকে ফলে কেন্দ্রকের আধান (বিদ্যুতের পরিমাণ) বৃদ্ধি পায়। তখন কেন্দ্রক কক্ষীয় ইলেকট্রনগুলিকে বেশী বলে আকর্ষণ করে, এতে কক্ষের ব্যাসার্দ্ধ হ্রাস পায়। এই জন্য ভারী পরমাণুর আয়তন (size) লঘু পরমাণুর সাইজের চেয়ে খুব বেশী বড় হয় না।

৬০। $_{11}Na^{23}$ এর অর্থ কি?

তোমরা জান Na মানে সোডিয়াম পরমাণু। বাঁ দিকের নিচের সংখ্যা বোঝায় পারমাণবিক সংখ্যা (অর্থাৎ কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা) এবং ডান দিকের উপরের সংখ্যা বোঝায় ভর সংখ্যা (কেন্দ্রকে প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা)।

সুতরাং $_{11}Na^{23}$ বোঝায় এমন একটি সোডিয়াম পরমাণু যার কেন্দ্রকে প্রোটন আছে 11টি (অবশ্য সব সোডিয়াম পরমাণুতেই 11টি প্রোটন থাকবে) এবং নিউট্রন আছে $23-11=12$টি।

৬১। আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি

রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি মৌলিকের কেন্দ্রক থেকে α, β ও γ রশ্মি নির্গত হয়। একে বলে তেজস্ক্রিয়তা। তেজস্ক্রিয়তা সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। তড়িৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগ, উষ্ণতা বা চাপের পরিবর্তন, চারপাশের কোন বিকিরণ, তেজস্ক্রিয় পদার্থটি মৌলিক না যৌগিক কি অবস্থায় আছে ইত্যাদি কোন কিছুই তেজস্ক্রিয়তাকে প্রভাবিত করে না। তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি হয় মৌলের কেন্দ্রকে, কক্ষীয় ইলেকট্রনের তেজস্ক্রিয়তায় কোন ভূমিকা নেই। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ (অর্থাৎ α, β ও γ রশ্মি) জীবিত কোষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

আলফা রশ্মি ঃ এটা আসলে কোন রশ্মি নয়, এ হল আলফা কণার প্রবাহ। আলফা কণা হল হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক অর্থাৎ একটি আলফা কণায় আছে দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন। এইজন্য কোন পরমাণুর কেন্দ্রক থেকে একটি α কণা বেরিয়ে গেলে সেই পরমাণুর প্রোটনের সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যা দুই কমে যায় এবং তার ভরসংখ্যা $2+2=4$ কমে যায়।

বিটা রশ্মি ঃ বিটা রশ্মিও কোন রশ্মি নয়, এ হল ইলেকট্রন প্রবাহ। আলফা ও বিটা রশ্মি কেন্দ্রক থেকে প্রচণ্ড বেগে (প্রতি সেকেণ্ডে 10^9 থেকে 10^{10} সেমি.) নির্গত হয়। কেন্দ্রক থেকে α ও β কণা কখনও একসঙ্গে বার হয় না।

পরমাণুর কেন্দ্রকে কোন ইলেকট্রন না থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রক থেকে ইলেকট্রন বার হয় কি করে? কেন্দ্রকের একটি নিউট্রন একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনে পরিনত হয়। এই ইলেকট্রনটি বিটা কণারূপে বেরিয়ে আসে। ফলে কেন্দ্রকের নিউট্রনের সংখ্যা এক কমে যায় কিন্তু প্রোটনের সংখ্যা এক বেড়ে যায়।

সুতরাং একটি β কণা বেরিয়ে গেলে পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা এক বেড়ে যায় কিন্তু ভর সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

গামা রশ্মি ঃ এ হল অতি ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ, আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্য, প্রশ্ন 60 এর উত্তর দেখ। সুতরাং এর বেগ হল আলোকের বেগ। এই রশ্মির পদার্থ ভেদ করে যাওয়ার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী, এমনকি 30 সেমি পুরু লোহার পাতকেও গামা রশ্মি ভেদ করতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে তেজস্ক্রিয়তার ফলে একটি মৌল অন্য মৌলে পরিণত হয় যেমন ইউরেনিয়াম শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় সীসায়। কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের প্রাথমিক পরমাণু সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যেতে (অর্থাৎ বাকি অর্ধেক পরমাণুর অন্য মৌলিকে পরিণত হতে) যে সময় লাগে তাকে বলে সেই মৌলিকের অর্ধায়ু (half life)। রেডিয়ামের অর্ধায়ু 1622 বৎসর অর্থাৎ আজ কোথাও 10 গ্রাম রেডিয়াম রেখে দিলে 1622 বৎসর পরে সেখানে থাকবে 5 গ্রাম রেডিয়াম, আরও 1622 বৎসর পরে অবশিষ্ট থাকবে 2·5 গ্রাম রেডিয়াম ইত্যাদি। ইউরেনিয়ামের অর্ধায়ু 4×10^9 বৎসর।

মনে রাখবে তত্ত্বগতভাবে যে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের সব পরমাণুর ভাঙনের জন্য অসীম সময় প্রয়োজন।

৬২। x এর মান কত?

$$_1H^2 + {}_{11}Na^{23} = {}_{11}Na^x + {}_1H^1$$

এ একটি নিউক্লিয়ার সমীকরণ। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় বাম ও দক্ষিণ পক্ষের ভরসংখ্যা সমান হবে আবার বাম ও দক্ষিণ পক্ষের পারমাণবিক সংখ্যাও সমান হবে। সুতরাং $2+23=x+1$ বা $x=23+2-1=24$।

এই সমীকরণ থেকে বোঝা যায় $_{11}Na^{23}$ এর কেন্দ্রককে ডয়টেরিয়াম কেন্দ্রক ($_1H^2$) দ্বারা আঘাত করলে $_{11}Na^{24}$ ও একটি প্রোটন ($_1H^1$) পাওয়া যায়। ডয়টেরিয়াম হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ, এতে আছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন।

নিউট্রনের চিহ্ন $_0n^1$ (কারণ নিউট্রনে কোন তড়িৎ নেই), ইলেকট্রনের চিহ্ন $_{-1}e^0$ (কারণ ইলেকট্রনের তড়িৎ ঋণাত্মক), প্রোটনের $_1p^1$ বা $_1H^1$ (অর্থাৎ সাধারণ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রক) এবং পজিট্রনের $_1e^0$। পজিট্রনের ভর ইলেকট্রনের সমান কিন্তু এ ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত।

৬৩। x কি বোঝাচ্ছে ?

$$_4Be^9 + {}_2He^4 = {}_6C^{12} + x$$

আগের নিয়ম থেকে পাচ্ছ x এর ভরসংখ্যা $= 9 + 4 - 12 = 1$ এবং পারমাণবিক সংখ্যা $= 4 + 2 - 6 = 0$ অর্থাৎ x একটি নিউট্রন, $_0n^1$।

৬৪। ইলেকট্রন ভোল্ট কিসের একক ?

ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির একক। একটি ইলেকট্রন স্থির অবস্থা থেকে এক ভোল্ট উচ্চ বিভবে গেলে যে গতিশক্তি লাভ করে তাই হল এক ইলেকট্রন ভোল্ট, eV। এক ইলেকট্রন ভোল্ট $= 1\ 6022 \times 10^{-19}$ জুল।

তোমরা জান পদার্থ ও শক্তি একই জিনিষের দুই রূপ। সেইজন্য ভরকে শক্তির এককেও প্রকাশ করা যায়। অনেক সময় ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদি ক্ষুদ্র কণার ভর শক্তির এককে প্রকাশ করা হয় যেমন একটি ইলেকট্রনের স্থির অবস্থায় ভর 0·5 MeV ; এক MeV মানে দশ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট (Mega electron Volt)। দেখা আলোর ফোটনের শক্তি কয়েক eV, এক্স রে ফোটনের শক্তি কয়েক হাজার eV।

৬৫। ফিসান কাকে বলে ?

ভারী মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রক ভেঙে মোটামুটি সমান ভরের দুটি কেন্দ্রক তৈরি করাকে বলে পরমাণু বিভাজন (Fission)। এতে কেন্দ্রকের কিছু পদার্থ শক্তিতে পরিণত হয় ফলে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয়।

যেমন ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম কেন্দ্রককে নিউট্রন কণা দ্বারা আঘাত করলে তাদের বিভাজন ঘটে। একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজনের ফলে নতুন একটি থেকে তিনটি নিউট্রন কণা বার হয়।

৬৬। চেন রিঅ্যাকসান কি ?

একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজনের ফলে এক থেকে তিনটি নতুন নিউট্রন কণা বার হয়। এই নিউট্রনগুলি আবার অন্য ইউরেনিয়াম পরমাণুকে বিভাজিত করে। এতে আবার নতুন নিউট্রন বেরিয়ে আসে এবং সব ইউরেনিয়াম পরমাণু বিশ্লিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বিভাজন প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। একেই বলে কেন্দ্রকের ধারাবাহিক বিক্রিয়া (chain reaction)। প্লুটোনিয়ামেও এরকম হয়ে থাকে। এই হল পারমাণবিক বোমার মূলনীতি।

যে যন্ত্রে নিয়ন্ত্রিতভাবে ধারাবাহিক বিক্রিয়ার সাহায্যে পরমাণু বিভাজনের দ্বারা তাপশক্তি সৃষ্টি করা যায় তাকে বলে পারমাণবিক চুল্লী (Nuclear Reactor)। পারমাণবিক চুল্লীর সাহায্যে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

৬৭। ফিউসান কাকে বলে ?

হাইড্রোজেন বা অন্য কোনও হালকা পরমাণুর সংযোজন দ্বারা ভারী পরমাণু গঠন করাকে বলে পরমাণু সংযোজন (Fusion)। এতেও কিছু পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ায় প্রচণ্ড তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। যেমন হাইড্রোজেনের দুইটি আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম (Deuterium $-{}_1H^2$) এবং ট্রাইটিয়ামের (Tritium $-{}_1H^3$) সংযোজনের ফলে হিলিয়াম ও নিউট্রন উৎপন্ন হয়

$${}_1H^2 + {}_1H^3 = {}_2He^4 + {}_0n^1 + \text{শক্তি } (17{\cdot}8 \text{ MeV})$$

এখানে (${}_1H^2 + {}_1H^3$) এর মোট ভর (${}_2He^4 + {}_0n^1$)-এর মোট ভরের চেয়ে বেশী, এই অতিরিক্ত ভরই শক্তিতে পরিণত হয়। এ হল হাইড্রোজেন বোমার মূলনীতি।

পরমাণু সংযোজনের জন্য আগে থেকে ডয়টেরিয়াম ও ট্রাইটিয়ামকে কয়েক লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে নেওয়া প্রয়োজন। এই জন্য এই ধরনের বিক্রিয়াকে বলে তাপনিউক্লীয় বিক্রিয়া (Thermonuclear Reaction)। হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের পূর্বে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাপ সৃষ্টি করা হয়। পরমাণু বোমার চেয়ে হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা অনেক বেশী।

বিজ্ঞানীদের ধারণা হাইড্রোজেনের সংযোজনে হিলিয়াম গঠনই কোটি কোটি বৎসর ধরে সূর্য ও অন্য নক্ষত্রগুলির প্রচণ্ড শক্তি বিকিরণের মূল রহস্য।

৬৮। সূর্যের আকর্ষণ বল কোন কাজ করে কি ?

না, কোন কাজ করে না।

সূর্যের আকর্ষণ বলের দিক ও পৃথিবীর সরণের দিক পরস্পর লম্ব অর্থাৎ তাদের মাঝখানের কোন $\theta = 90°$। সুতরাং এই বলের কাজ $W = Ps \cos \theta = Ps \cos 90° = Ps \times O = O$।

৬৯। লেজার কাকে বলে ?

লেজার পুরো কথাটা হল Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation—Laser অর্থাৎ বিকিরণের উদ্দীপ্ত নিঃসরণের ফলে আলোকের বিবর্ধন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শোয়ালভ (Schawlov) ও টাউনস (Townes) ১৯৫৪ সালে এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় বেসভ (Basov) ও প্রোখোরভ (Prokhorov) ১৯৫৮ সালে লেজার আবিষ্কার করেন।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (Max Planck) ও আইনস্টাইনের কোয়ান্টাম তত্ত্ব (Quantum Theory) অনুযায়ী আলো কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। এই কণাদের বলা হয় ফোটন (Photon)। প্রত্যেক ফোটনে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি থাকে। এই শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে সেই আলোর ফোটন সেই আলোর কম্পাঙ্কের উপর। যে আলোর কম্পাঙ্ক যত বেশী সেই আলোর প্রত্যেক ফোটনের শক্তিও তত বেশী। কোন আলোর কম্পাঙ্ক ν (নিউ) হলে সেই আলোর প্রত্যেক ফোটনের শক্তি $E=h\nu$, যেখানে h হল প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক (Planck's constant) যার মান $h=6\cdot6262\times10^{-34}$ জুল-সেকণ্ড।

কোন পরমাণু সাধারণ অবস্থায় (Ground state) থাকলে তার শক্তি সবচেয়ে কম থাকে। এই পরমাণুকে উপযুক্ত শক্তির ফোটন দ্বারা আঘাত করলে তা এই ফোটনকে শোষণ করে, ফলে তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই পরমাণুকে বলে উত্তেজিত (excited) পরমাণু। একটু পরেই উত্তেজিত পরমাণু নিজে থেকেই ফোটন বর্জন করে পূর্বের সাধারণ অবস্থায় ফিরে যায়। একে বলে বিকিরণের স্বতঃনিঃসরণ (spontaneous emission), স্বতঃ নিঃসরণের বেলা বিকিরণ সবদিকেই ছড়িয়ে পড়ে।

উপযুক্ত শক্তির ফোটন শোষণ করে যে পরমাণু উত্তেজিত অবস্থায় আছে তাকে আবার একই শক্তির ফোটন দ্বারা আঘাত করলে সেই পরমাণু একসঙ্গে দুটো ফোটন বর্জন করে। ফলে নিঃসৃত আলো খুব জোরালো হয়। একে বলে উদ্দীপ্ত (stimulated) নিঃসরণ। এই হল বিকিরণের উদ্দীপ্ত নিঃসরণের ফলে আলোর বিবর্ধনের মূলনীতি। মাইক্রোওয়েভের (Microwave—এক মিলিমিটার থেকে 30 সেমি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ, দেখা আলোর

চেয়ে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশী) বেলা অনুরূপ ঘটনাকে বলা হয় Maser—Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

লেজার রশ্মির প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি—একমুখীনতা অর্থাৎ এই রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে না পড়ে একই দিকে যায়, এই আলো অতি তীব্র এবং এই আলো একই কম্পাঙ্কের অর্থাৎ এক রঙের হয়।

লেজার রশ্মির রং সাধারণতঃ লাল, নীল, নীলাভ সবুজ বা অদৃশ্য আলো হয়। অ্যালুমিনাম অক্সাইডের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে ক্রোমিক যৌগিক মিশিয়ে তৈরী করা কৃত্রিম চুনীর কেলাসের সাহায্যে পাওয়া যায় লাল রঙের লেজার। হিলিয়াম নিয়নের মিশ্রণ ও আর্গন ক্রিপ্টনের মিশ্রণের সাহায্যে যথাক্রমে পাওয়া যায় লাল ও নীলাভ সবুজ বর্ণের লেজার।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় লেজারের ব্যাপক ব্যবহার আছে। এর সাহায্যে গ্যাসকে আয়নে পরিণত করা, ধাতুর পাত কাটা, পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি করা যায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানেও লেজারের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। ক্যানসার কোষ ধ্বংস করা, রক্তপাতহীন অস্ত্রোপচার, কোষ ও ক্রোমোজোমের মাইক্রোসার্জারি, হাড়ে ছিদ্র করা, চোখের সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার (যেমন রেটিনা বিচ্যুতির ক্ষেত্রে) ইত্যাদিতে লেজার ব্যবহৃত হয়।

৭০। ন্যানো মানে কি ?

মাইক্রো, ন্যানো ও পিকো বোঝায় অংশ আর মেগা, গিগা ও টেরা বোঝায় গুন।

মাইক্রো (micro) $=\frac{1}{10^6}$	মেগা (Mega) $=10^6$
ন্যানো (nano) $=\frac{1}{10^9}$	গিগা বা জিগা (Giga) $=10^9$
পিকো (pico) $=\frac{1}{10^{12}}$	টেরা (Tera) $=10^{12}$

যেমন এক ন্যানোগ্রাম = এক গ্রামের একশকোটি ভাগের এক ভাগ, এক মেগাটন = দশলক্ষ টন ইত্যাদি।

৭১। এক গ্রাম ভর থেকে কতটা শক্তি পাওয়া যায়?

আপেক্ষিকতাবাদ (Theory of Relativity) থেকে আমরা জানি m ভরকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে পরিণত করলে $E=mc^2$ পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, c যখন শূন্য মাধ্যমে আলোকের বেগ অর্থাৎ $c=3\times10^{10}$ সেমি. প্রতি সেকেণ্ডে। সুতরাং এক গ্রাম ভর থেকে যতটা শক্তি পাওয়া যায় তার পরিমাণ

$E=1\times c^2$ আর্গ $=(3\times10^{10})^2$ আর্গ

$=9\times10^{20}$ আর্গ $=9\times10^{13}$ জুল

$=2{\cdot}15\times10^{13}$ ক্যালরি।

বার গ্রাম কার্বন দহনে 97000 ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়। এই হিসাবে এক গ্রাম ভর থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তা পেতে হলে 2700 মেট্রিক টন কার্বনকে দহন করতে হবে। তাহলে দেখতে পাচ্ছ এই শক্তি কি বিরাট!

৭২। বস্তুর ভর ও গতিবেগের সম্পর্ক কি?

আপেক্ষিকতাবাদে আইনষ্টাইন দেখিয়েছেন পদার্থের গতিবেগ বৃদ্ধি পেলে তার ভরও বৃদ্ধি পায়। অবশ্য বেগ আলোকের বেগের কাছাকাছি না হলে এই ভরবৃদ্ধি খুবই নগণ্য। বেগ ও ভরের সম্পর্ক হল

$$m_v=\frac{m_o}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

যখন m_o = স্থির অবস্থায় বস্তুর ভর (Rest mass) এবং m_v = v বেগে বস্তুটির ভর। এই হিসাবে কোন বস্তুর বেগ আলোকের বেগের সমান হলে তার ভর হবে অনন্ত অর্থাৎ কোন বস্তুর বেগ আলোক বেগের বেশী হতে পারে না।

৭৩। মিঙ্কোয়াস্কি কাল্পনিক সময় অক্ষ কি?

আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী এই মহাবিশ্ব চতুর্মাত্রিক। চারটি মাত্রা হল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও সময়। প্রখ্যাত রাশিয়ান গণিতবিদ্ মিঙ্কোয়াস্কির নামানুসারে এই সময় অক্ষকে বলে মিঙ্কোয়াস্কি কাল্পনিক সময় অক্ষ (Minkowaski Imaginary Time Axis)। কাল্পনিক বলার কারণ এর বর্গ $(ict)^2=i^2c^2t^2=-c^2t^2$ ঋণাত্মক ($i=\sqrt{-1}$, c = আলোক বেগ, ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলা হয়)।

৭৪। মেসন ও নিউট্রিনো কি ?

মেসন (Meson অর্থাৎ মধ্যবর্তী—এদের ভর ইলেকট্রন ও প্রোটনের মধ্যবর্তী বলে এই নাম) একধরণের মূল কণা। এরা খুবই ক্ষণস্থায়ী। ধন মেসনে ইলেকট্রনের সমান ধনতড়িৎ ও ঋণ মেসনে ইলেকট্রনের সমান ঋণতড়িৎ থাকে বিভিন্ন ধরনের মেসন আছে। মিউ (μ) মেসনের ভর ইলেকট্রনের ভরের 207 গুন। এরা দুধরনের, ধন (μ^+) ও ঋণ (μ^-)। মিউ মেসনের আয়ু মাত্র 2 মাইক্রোসেকেণ্ড (এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের দুভাগ)।

ধণ পাই (π^+) বা ঋণ পাই (π^-) মেসনের ভর ইলেকট্রনের ভরের 273 গুন। পাই মেসন তড়িৎনিরপেক্ষও হতে পারে, তড়িৎনিরপেক্ষ পাই (π^0) মেসনের ভর ইলেকট্রনের ভরের 264 গুণ। পরমাণুর কেন্দ্রকে নিউট্রন (n) প্রোটনে (p) ও প্রোটন নিউট্রনে অনবরত রূপান্তরিত হতে থাকে। এসময় ঋণ পাই মেসন উৎপন্ন হয়। এর ফলে যে আকর্ষণী বল সৃষ্ট হয় তার জন্যই পরমাণুর কেন্দ্রকে একাধিক প্রোটন একসঙ্গে থাকতে পারে। নাহলে ধণতড়িৎযুক্ত প্রোটনগুলির পারস্পরিক বিকর্ষণে কেন্দ্রক ভেঙে যেত।

$$n \rightleftharpoons p^+ + \pi^-$$

কে (k) মেসনের ভর ইলেকট্রনের ভরের 970 গুণ। এরা ধনাত্মক (k^+), ঋণাত্মক (k^-) বা তড়িৎ নিরপেক্ষ (k^0) হতে পারে।

হাইপারন (Hyperon) হল এমন এক ধরনের মেসন যাদের ভর প্রোটনের ভরের চেয়ে বেশী।

পরমাণুর কেন্দ্রকের গঠনে প্রোটন ও নিউট্রন অনেকটা ইটের মত ও π মেসন সিমেন্টের মত কাজ করে।

নিউট্রিনো (Neutrino, ν) হল অতি অল্প ভরবিশিষ্ট তড়িৎহীন মূল কণা। এদের ভর ইলেকট্রনের ভরের একশ ভাগের চার ভাগেরও কম। পরমাণুর কেন্দ্রকে ইলেকট্রন না থাকা সত্বেও তেজস্ক্রিয়তার সময় কেন্দ্রক থেকে ইলেকট্রন (বিটা রশ্মি) নির্গত হয়। এর কারণ কেন্দ্রকের নিউট্রন প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রিনোতে পরিণত হয়।

$$n \rightarrow p^+ + e^- + \nu$$

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তায় অনেক সময় পজিট্রন (Positron) নির্গত হয়। পজিট্রন (e^+) হল ধনাত্মক ইলেকট্রন অর্থাৎ এর ভর ও তড়িতের পরিমাণ ইলেক-

ট্রনের সমান কিন্তু তড়িতের প্রকৃতি ধনাত্মক। এখানে প্রোটন নিউট্রন, পজিট্রন ও নিউট্রিনোতে পরিণত হয়।

$$p^{+} \rightarrow n + e^{+} + \nu$$

যেমন ম্যাগনেশিয়াম পরমাণুকে আলফা কণা দ্বারা আঘাত করলে প্রথমে তেজস্ক্রিয় সিলিকন উৎপন্ন হয়। এই তেজস্ক্রিয় সিলিকন পজিট্রন নির্গত করে অ্যালুমিনিয়ামে পরিণত হয়।

$${}_{12}Mg^{24} + {}_{2}He^{4} = {}_{14}Si^{27} + {}_{0}n^{1} \text{ (নিউট্রন)}$$

$${}_{14}Si^{27} = {}_{13}Al^{27} + e^{+} + \nu$$

৭৫। বিপরীত পদার্থ কাকে বলে?

সাধারণ সব পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রকে থাকে তড়িৎহীন নিউট্রন ও তড়িৎ ধনাত্মক প্রোটন ও বাইরে বিভিন্ন কক্ষে ঘোরে ঋণাত্মক ইলেকট্রন। কিন্তু এমন পদার্থও হওয়া সম্ভব যার পরমাণুর কেন্দ্রকে আছে নিউট্রন ও ঋণাত্মক প্রোটন বা অ্যান্টি-প্রোটন এবং বাইরে ঘুরছে ধনাত্মক ইলেকট্রন বা পজিট্রন। অ্যান্টি-প্রোটনের ভর ও তড়িতের পরিমাণ প্রোটনের সমান কিন্তু এর তড়িৎ ঋণাত্মক। এই ধরনের পদার্থকে বলে বিপরীত পদার্থ (Anti-matter)।

সাধারণ পদার্থ ও বিপরীত পদার্থ একসঙ্গে হলে কিন্তু উভয়েই ধ্বংস হয়ে শক্তিতে পরিণত হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মহাকাশের অনেক গ্যালাক্সি (প্রশ্ন ৮৩) হয়ত সম্পূর্ণরূপে বিপরীত পদার্থে তৈরী।

৭৬। কৃত্রিম মৌলান্তর ও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা কি?

নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় একটি মৌলের অন্য মৌলে পরিণত হওয়াকে বলে মৌলান্তর (Transmutation of elements)। যেমন তেজস্ক্রিয়তার ফলে ইউরেনিয়ামের থোরিয়ামে বা শেষ পর্যন্ত সীসায় পরিণত হওয়া।

আর বাইরে থেকে পরমাণুর কেন্দ্রকে আলফা কণা, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদির আঘাতে কৃত্রিম উপায়ে একটি মৌল থেকে অন্য মৌল সৃষ্টি করাকে বলে কৃত্রিম (artificial) মৌলান্তর। কৃত্রিম মৌলান্তরের সাহায্যে সোনাও প্রস্তুত করা যায় তবে তার দাম পড়বে প্রাকৃতিক সোনার চেয়ে অনেক বেশী।

কৃত্রিম মৌলান্তরে অনেক সময় তেজস্ক্রিয় মৌল উৎপন্ন হয়। এই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলের কেন্দ্রক থেকে নিজে থেকেই অবিরত ইলেকট্রন বা পজিট্রন বা

গামা রশ্মি নির্গত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা কোন স্থায়ী যৌগে পরিণত হয়। মাদাম কুরীর কন্যা আইরিন কুরী (Irene Curie) ও তাঁর স্বামী এফ. জোলিও (F. Joliot) 1932 সালে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা (কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় যৌগের তেজস্ক্রিয়তা) আবিষ্কার করেন। তাঁরা দেখান যে বোরনকে আলফা কণা দ্বারা আঘাত করলে নাইট্রোজেনের একটি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক (radioisotope) পাওয়া যায়। এই সমস্থানিকটি পজিট্রন নির্গত করে কার্বনের একটি স্থায়ী সমস্থানিকে পরিণত হয়।

$$_5B^{10} + _2He^4 = _7N^{13} + _0n^1$$ (নিউট্রন)

$$_7N^{13} = _6C^{13} + _1e^0$$ (পজিট্রন)

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তায় কয়েক ধরনের অসাধারণ ঘটনা লক্ষ্য করা যায় যার মধ্যে প্রধান হল K ইলেকট্রন অধিকার (K electron capture) ও নিউক্লিয় আইসোমারিজম (Nuclear isomerism)।

কখনও কখনও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পরমাণুর কেন্দ্রক কেন্দ্রকের সবচেয়ে নিকটের কক্ষের (অর্থাৎ K কক্ষের) একটি ইলেকট্রন টেনে নেয় এবং কেন্দ্রকের একটি প্রোটন এই ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিউট্রনে পরিণত হয়। ফলে পরমাণুটির পরমাণু ক্রমাঙ্ক এক কমে যায় কিন্তু ভর সংখ্যা ঠিক থাকে। একে বলে K ইলেকট্রন অধিকার যেমন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় ভ্যানাডিয়াম পরমাণু এর ফলে টিটানিয়ামে পরিণত হয়।

$$_{23}V^{40} + _{-1}e^0 = _{22}Ti^{40}$$

কোনও কোনও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় যৌগের বিভিন্ন পরমাণুর তেজস্ক্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে হয় যদিও এই পরমাণুদের প্রোটনের সংখ্যাও সমান ও নিউট্রন সংখ্যাও সমান। একে বলে নিউক্লিয় আইসোমারিজম।

নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার মত সর্বদা কিছু তাপ উৎপন্ন বা শোষিত হয়। তবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যেখানে গ্রাম অণুতে 10 থেকে 100 কিলোক্যালরি তাপের পরিবর্তন হয় নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় সেখানে অনেক বেশী, গ্রাম অণুতে 10^9 কিলো ক্যালরির মত তাপের পরিবর্তন হয়।

৭৭। রেডিও কার্বন ডেটিং কাকে বলে ?

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের অনেক ব্যবহার আছে। এর মধ্যে একটি হল পুরানো জিনিষের বয়স নির্ণয় করা। পুরানো জৈব পদার্থের

মধ্যে তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণু $_6C^{14}$ ও সাধারন কার্বন পরমাণু $_6C^{12}$ এর অনু-পাত বার করে তার বয়স নির্ণয় করা যায়। বিজ্ঞানী লিবি (Libby) এর পদ্ধতি আবিষ্কার করে 1960 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এইভাবে বয়স নির্ণয় করাকেই রেডিও কার্বন ডেটিং বলে (Radio Carbon dating)।

মহাজাগতিক রশ্মির নিউট্রন কণা বাতাসের নাইট্রোজেনকে তেজস্ক্রিয় কার্বনে পরিণত করে।

$$_7N^{14} + {_0n^1} = {_6C^{14}} + {_1H^1} \text{ (প্রোটন)}$$

এই তেজস্ক্রিয় কার্বন কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়ে সমস্ত জীবিত উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে, উদ্ভিদ থেকে তা খাদ্যের মাধ্যমে প্রাণীদের দেহেও প্রবেশ করে। বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডে তেজস্ক্রিয় কার্বন ও সাধারণ কার্বনের অণুপাতের মান $1 : 10^{12}$। সমস্ত জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে ও এই অণুপাতের মনে একই অর্থাৎ $C^{14} : C^{12} = 1 : 10^{12}$ থাকে।

কিন্তু প্রাণী বা উদ্ভিদের মৃত্যুর পর তারা আর তেজস্ক্রিয় বা সাধারণ কোন কার্বনই গ্রহণ করে না। আর তাদের দেহের তেজস্ক্রিয় কার্বন ধীরে ধীরে নাইট্রোজেনে পরিণত হয়।

$$_6C^{14} = {_7N^{14}} + {_{-1}e^0} \text{ (ইলেকট্রন)}$$

সুতরাং প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত্যুর পরে তাদের দেহের অবশিষ্টাংশের (যেমন কাঠ, চুল ইত্যাদি) $C^{14} : C^{12}$ অণুপাতের মান $1 : 10^{12}$ এই মান হতে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এই মান কতটা কমেছে তা থেকে সেই বস্তুর বয়স অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর কত বৎসর অতিবাহিত হয়েছে তা নির্ণয় করা যায়। যেমন তেজস্ক্রিয় কার্বনের অর্ধায়ু 5668 বৎসর পর অর্থাৎ 5668 বৎসর পরে তেজস্ক্রিয় কার্বনের অর্ধেক অবশিষ্ট থাববে ; 5668×2 বা 11336 বৎসর পরে মাত্র 1/4 অংশ অবশিষ্ট থাকবে, এইভাবে হিসাব করে বয়স বার করা হয়।

সেই বস্তুতে কতটা তেজস্ক্রিয় কার্বন অবশিষ্ট আছে তা নির্ণয় করা হয় বস্তুটি থেকে কত ইলেকট্রন নির্গত হচ্ছে তা গাইগার-মুলার গণক (Geiger-Muller counter) যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করে।

৭৮। ভর ত্রুটি কি ?

সাধারণ অক্সিজেন পরমাণুর ($_8O^{16}$) ভরকে 16 ধরলে সেই অনুপাতে একটি ইলেকট্রনের ভর 0·00055, একটি প্রোটনের ভর 1·00759, একটি নিউ-

ট্রনের ভর 1·00898 এবং একটি সাধারন হিলিয়াম পরমাণুর ($_2He^4$) ভর 4·00386। একটি সাধারণ হিলিয়াম পরমাণুতে আছে 2টি প্রোটন, 2টি নিউট্রন ও 2টি ইলেকট্রন। সুতরাং এদের মোট ভর—

2টি প্রোটনের ভর $= 2 \times 1·00759 = 2·01518$

2টি নিউট্রনের ভর $= 2 \times 1·00898 = 2·01796$

2টি ইলেকট্রনের ভর $= 2 \times 0·00055 = 0·00110$

মোট ভর = 4·03424

সুতরং দেখা যাচ্ছে 2টি প্রোটন + 2টি নিউট্রন + 2টি ইলেকট্রনের ভর একটি হিলিয়াম পরমাণুর ভর থেকে $4·03424 - 4·00386 = 0·03038$ বেশী। এর কারণ কি ?

কারণ হল প্রোটন ও নিউট্রনের সংযোগে পরমাণুর কেন্দ্রক সৃষ্টি হওয়ার সময় প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়। প্রোটন ও নিউট্রনদের কিছুটা ভরই এক্ষেত্রে শক্তিতে পরিণত হয়। ফলে প্রোটন ও নিউট্রনের সংযোগে পরমাণুর কেন্দ্রক উৎপন্ন হলে প্রোটন ও নিউট্রনদের মোট ভর হতে কেন্দ্রকের ভর কিছু কম হয়। একেই বলে ভর ত্রুটি (Mass defect)। এখানে হিলিয়াম পরমাণুর ভর ত্রুটি হল 0·03038।

চারটি হিলিয়াম পরমাণুর মোট প্রোটন সংখ্যা 8, মোট নিউট্রন সংখ্যা 8 এবং মোট ইলেকট্রন সংখ্যাও 8। আবার একটি সাধারণ অক্সিজেন পরমাণুর প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন প্রত্যেকের সংখ্যাও 8। কিন্তু চারটি সাধারণ হিলিয়াম পরমাণুর মোট ভর ($4 \times 4·00386 = 16·01444$) একটি সাধারণ অক্সিজেন পরমাণুর ভরের (16·00000) চেয়ে বেশী। এখানেও ভর ত্রুটির জন্য এমন হয়।

৭৯। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা কাকে বলে ?

কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়, পদার্থের এই তিনটি অবস্থা ছাড়াও আর একটি চতুর্থ অবস্থা আছে, একে বলে প্লাজমা (Plasma)।

কোন পদার্থের পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে বা পরমাণুতে বাইরে থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন প্রবেশ করলে সেই পরমাণুকে বলে আয়ন (Ion)। আর এই ঘটনাকে বলে আয়নিভবণ (Ionisation)।

ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে পরমাণুতে ধনাত্মক প্রোটনের আধিক্য ঘটায় তা ধন আয়নে আর ইলেকট্রন প্রবেশ করলে পরমাণুতে ঋণাত্মক ইলেকট্রনের আধিক্য ঘটায় তা ঋন আয়নে পরিণত হয়। আয়নিভবন বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন উচ্চ তাপমাত্রা, শক্তিশালী তড়িৎক্ষেত্র, দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনের আঘাত ইত্যাদি।

অত্যুচ্চ উষ্ণতায় (এক কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস বা তার বেশী) যখন কোন গ্যাস প্রায় সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় অর্থাৎ যখন প্রায় সব পরমাণুই আয়নে পরিণত হয় তখন এই পদার্থকে বলে প্লাজমা। সুতরাং প্লাজমা হল আয়ন ও ইলেকট্রনের সমাবেশ। প্লাজমা বিদ্যুতের সুপরিবাহী এবং চৌম্বক ক্ষেত্রসম্পন্ন। প্লাজমার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মহাবিশ্বের বেশীর ভাগ পদার্থই প্লাজমা আকারে আছে।

৮০। নিয়ন্ত্রিত তাপ-নিউক্লিয় বিক্রিয়া কাকে বলে ?

হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের সময় যে তাপ-নিউক্লিয় বিক্রিয়া ঘটে তা অনিয়ন্ত্রিত। ফলে উৎপন্ন প্রচণ্ড শক্তিকে কোন প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যায় না। এর জন্য বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন তাপ-নিউক্লিয় বিক্রিয়াকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে যাতে উৎপন্ন বিপুল শক্তিকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো যায়। এই ধরনের বিক্রিয়াই হোল নিয়ন্ত্রিত (controlled) তাপ-নিউক্লিয় বিক্রিয়া।

এর মূল নীতি হল হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপের (প্রোটিয়াম, H^1, ডয়টেরিয়াম, H^2 ও ট্রাইটিয়াম, H^3) মিশ্রণকে এক কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস বা তার বেশী উষ্ণতায় প্লাজমায় পরিণত করে তাদের বিক্রিয়ায় হিলিয়াম উৎপন্ন করা। আর এতে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হবে তা থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা। তবে এতে প্রধান সমস্যা হল এই প্লাজমাকে কোন্ পাত্রে রাখা হবে? কারণ এত উষ্ণতায় সব পাত্রই বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। এর জন্য বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন কোন পাত্র ব্যবহার না করে প্রচণ্ড চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে এই প্লাজমাকে নির্দিষ্ট জায়গায় আবদ্ধ রাখতে।

৮১। সাইক্লোট্রন কি ?

যে যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন, আলফা কণা ইত্যাদিকে প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন করা।

যায় তাকে বলে সাইক্লোট্রন (cyclotron)। এই তীব্র বেগসম্পন্ন কণা দ্বারা পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করে নিউক্লিয় বিক্রিয়া ঘটানো হয়।

৮২। অ্যাস্ট্রনমিক্যাল একক ও পারসেক কি ?

পৃথিবী ও সূর্যের গড় দূরত্বকে বলে অ্যাস্ট্রনমিক্যাল একক (Astronomical Unit বা A. U.)। এক A U. $=92.9\times10^6$ মাইল বা 1.495985×10^8 কিলোমিটার।

সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ পৃথিবী ও সূর্য সংযোগকারী রেখা) কোন তারকাতে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে বলে সেই তারকার স্টেলার প্যারালেক্স (Steller parallax)। অন্যভাবে বলা যায় তারকাকে শীর্ষ ধরে তারকা, সূর্য ও পৃথিবী দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের শীর্ষকোণই সেই তারার স্টেলার প্যারালেক্স। যে তারা যত দূরবর্তী তার প্যারালেক্স তত কম।

যে বস্তুর স্টেলার প্যারালেক্স এক সেকেণ্ড (অর্থাৎ এক ডিগ্রীর 1/3600 অংশ) সেই বস্তুর দূরত্বকে বলে এক পারসেক (Parsec বা PC Parallax এর Par ও second এর sce নিয়ে গঠিত)। এক পারসেক $=3.2615$ আলোকবর্ষ $=3.085\times10^{13}$ কিলোমিটার।

৮৩। গ্যালাক্সি ও নেবুলা কাকে বলে ?

গ্যালাক্সি (Galaxy) হল কোটি কোটি থেকে শত শত বিলিয়ন নক্ষত্র ও বিপুল পরিমাণ ধূলি ও গ্যাসের সমাহার। নক্ষত্রের সংখ্যা সাধারণতঃ 10^8 থেকে 10^{13} এর মধ্যে ; এরা মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা একই গ্যালাক্সিতে আবদ্ধ। গ্যালাক্সির ব্যাস 5000 থেকে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ।

এক বিলিয়ন (Billion) $=10^9$। পূর্বে এক বিলিয়ন $=10^{12}$ ধরা হোত, বর্তমানে 10^{12} কে এক ট্রিলিয়ন (Trillion) বলা হয়।

নেবুলা (Nebula) হল নক্ষত্রদের মাঝখানের শূন্যস্থানে ভাসমান ধূলি ও গ্যাস। এই ধূলি বা গ্যাসের ঘনত্ব অতি সামান্য। পৃথিবীতে সবচেয়ে হালকা যে শূন্যস্থান (Vacuum) সৃষ্ট করা সম্ভব হয়েছে তার চেয়েও এদের ঘনত্ব কম। নেবুলার উষ্ণতাও খুব কম।

এই গ্যাসের প্রধান উপাদান হল হাইড্রোজেন, তাছাড়া আছে হিলিয়াম, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, নিয়ন ও গন্ধক। সোডিয়াম, পটাশিয়াম,

ক্যালশিয়াম ইত্যাদিও অতি সামান্য পরিমাণে আছে। এর মধ্যে কিছু যৌগিক পদার্থ যেমন, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প, ফরমালডিহাইড HCHO, কার্বন মনো-ক্সাইড., সায়ানোজেন (CN $_2$, মিথাইল অ্যালকোহল CH_3OH, ইথাইল অ্যালকোহল C_2H_5OH ইত্যাদিরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

আর ধূলিকনা প্রধানতঃ গ্র্যাফাইট, লোহা ও বিভিন্ন সিলিকেট দ্বারা গঠিত।

৮৪। ছায়াপথ গ্যালাক্সি কি ?

মহাবিশ্বে কোটি কোটি গ্যালাক্সি আছে, তার মধ্যে যে গ্যালাক্সিতে আমাদের সূর্য অবস্থিত তাকে বলে ছায়াপথ (Milky way) গ্যালাক্সি। ছায়াপথ গ্যালাক্সির নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় 10^{11} (দশ হাজার কোটি)। কিছু নক্ষত্রের বয়স 10^{10} বছরেরও বেশী। বিজ্ঞানী এডুইন হাবল (Edwin Hubble) প্রথম দেখান মহাবিশ্বে আমাদের গালাক্সি ছাড়া আরও অনেক গ্যালাক্সি আছে।

ছায়াপথ গ্যালাক্সির আকৃতি চ্যাপ্টা গোলক বা চাকার মত, এই চাকার ব্যাস প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ। চাকার সব জায়গা সমান পুরু নয়। মাঝখানটা সবচেয়ে পুরু ; মাপ তিন চার হাজার আলোকবর্ষ ; সবচেয়ে কম পুরু পরিধি অঞ্চলে। সূর্যের অবস্থানে এর বেধ 1000 হতে 2000 আলোকবর্ষ। এই চাকার কেন্দ্রস্থলে দু পাশ থেকে দুটি বাহু বেরিয়ে এসে চাকাকে পেঁচাবার চেষ্টা করছে। এই জন্য এই ধরনের গ্যালাক্সিকে বলে পেঁচানো গ্যালাক্সি (Spiral galaxy), এ যাবৎ আবিষ্কৃত গ্যালাক্সিদের প্রায় 80% ই পেঁচানো গ্যালাক্সি।

এই ছায়াপথ গ্যালাক্সির কেন্দ্র সূর্য থেকে প্রায় 33000 আলোকবর্ষ দূরে ধনু রাশির দিকে অবস্থিত। এই চাকা আবর্তনশীল, অন্যান্য পেঁচানো গ্যালাক্সির মত এই চাকাও কেন্দ্রগামী অক্ষের চারপাশে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। সূর্যও সেকেণ্ডে প্রায় 250 কিলোমিটার বেগে এই অক্ষের চারপাশে প্রায় বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। সূর্যের একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে 25 কোটি বৎসর, এই সময়কে বলে কসমিক বৎসর (Cosmic year) ছায়াপথ গ্যালাক্সির ভর প্রায় একশ বিলিয়ন সৌরভর বা 2×10^{44} গ্রাম।

এই চাকার কেন্দ্রদেশে তারারা খুব ঘন সন্নিবিষ্ট, এখানে এক ঘন পারসেক জায়গায় অবস্থান করছে কয়েক মিলিয়ন তারা। কিন্তু সূর্যের কাছাকাছি অঞ্চলে এক ঘন পারসেক জায়গায় আছে মাত্র একটি তারা। সূর্য এই চাকার কেন্দ্রস্থলে থাকলে রাত্রে আকাশে আমরা কয়েক লক্ষ উজ্জ্বল তারা দেখতে পেতাম, ফলে

রাতের আকাশ 200টি পূর্নিমার চন্দ্রে আলোকিত এখনকার রাত্রির আকাশের মত উজ্জল হোত। এত আলোতে কিন্তু দূরের তারাদের দেখা যেত না। আবার এত কাছাকাছি থাকাতে তারায় তারায় সংঘর্ষের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যেত, সেক্ষেত্রে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বও হয়ত অনেক আগেই লোপ পেয়ে যেত! এই ঘন সন্নিবিষ্ট কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ব্যাস প্রায় 10000 আলোকবর্ষ।

আমাদের এই ছায়াপথ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে আছে প্রায় 1000 পারসেক ব্যাসের এক ঘূর্ণমান গ্যাসের চাকতি। পরিধির কাছে এর বেগ প্রায় সেকেণ্ডে 250 কিমি ; কেন্দ্রের দিকে বেগ ক্রমশঃ কম। কেন্দ্র থেকে প্রায় 300 পারসেক দূরে রয়েছে অর্ধচক্রাকার মালার মত এক আণবিক মেঘ যা অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।

আবার এই চাকতির দুপাশে হাইড্রোজেনের দুটি সম্প্রসারণশীল অর্ধচক্রাকার বিচ্ছিন্ন বলয় বা বাহু আছে। একটি বাহু আছে চাকতির কেন্দ্র থেকে আমাদের দিকে 3000 পারসেক দূরে, আমাদের দিকে এর বেগ সেকেণ্ডে 50 কিমি। একে বলে তিন কিলোপারসেক বাহু। অন্য বাহুটি আছে কেন্দ্রের ওপাশে আমাদের বিপরীত দিকে এবং সেকেণ্ডে 135 কিমি বেগে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, একে বলে 135 কিমি/সেকেণ্ড সম্প্রসারমান বাহু। চাকতির কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব 2500 থেকে 4000 পারসেক।

৮৫। যুগল নক্ষত্র ও পরিবর্তনশীল নক্ষত্র কি?

একজোড়া নক্ষত্রের উভয়েই যদি উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে (উপবৃত্তের ফোকাস হল তাদের সাধারন ভরকেন্দ্র (centre of mass) তবে তাদের বলে যুগ্ম বা যুগল নক্ষত্র (Binary star)।

যে সব নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা কমে বাড়ে তাদের বলে পরিবর্তনশীল নক্ষত্র (Variable star)। এদের কতকগুলির উজ্জ্বলতা নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়।

৮৬। লাল দৈত্য. শ্বেত বামন, নিউট্রন নক্ষত্র ও ব্ল্যাক হোল কাকে বলে?

মহাবিশ্বে ভাসমান ধূলি ও গ্যাস (নেবুলা) থেকে ধীরে ধীরে নক্ষত্রের জন্ম হয়। এই ধূলি ও গ্যাস মাধ্যাকর্ষণের ফলে সঙ্কুচিত হয়ে পরস্পরের কাছাকাছি

এলেই নক্ষত্রের সৃষ্টি হয় আর সঙ্কোচনের ফলে মাধ্যাকর্ষণজনিত স্থিতিশক্তি তাপশক্তিতে পরিণত হয়। এতে নক্ষত্রের উষ্ণতা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায় ও তা প্রায় এক কোটি ডিগ্রিতে পরিণত হলে তাপনিউক্লিয় বিক্রিয়া (ফিউসান) সুরু হয়। এই বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয়। এতে নক্ষত্রের ভর কিছু হ্রাস পায় যদিও তা খুব সামান্য, হাজার ভাগের সাত ভাগ মাত্র (সব হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হলে)।

এইভাবে প্রায় সব হাইড্রোজেনই হিলিয়ামে পরিণত হলে নক্ষত্রের অভ্যন্তর ভাগ বা কোরে (core) তাপনিউক্লিয় বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় কারণ হিলিয়াম থেকে অন্য ভারী মৌলিকে সংযোজনের বিক্রিয়ায় অনেক বেশী উষ্ণতা প্রয়োজন। এই অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে কোর সঙ্কুচিত হয় কিন্তু নক্ষত্রের বহির্ভাগ প্রসারিত হয় কারণ বহির্ভাগে তখনও হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামে সংযোজন বিক্রিয়া কিছু পরিমাণে চলতে থাকে। (মনে রেখ মাধ্যাকর্ষণ নক্ষত্রকে সঙ্কুচিত করতে চায় কিন্তু তাপ-নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপশক্তি তাকে প্রসারিত করতে চায়। সুতরাং তাপনিউক্লিয় বিক্রিয়ার শেষে মহাকর্ষের প্রভাবে নক্ষত্রের কেন্দ্র সঙ্কুচিত হয়।) প্রসারিত হওয়ায় এর উষ্ণতা কমে যায় তখন এই নক্ষত্রকে বলে লাল দৈত্য (Rad giant)। এর উপরিতলের উষ্ণতা 3000°K থেকে 7000°K [কেলভিন অর্থাৎ পরম উষ্ণতা, $x°K = (x+273)°$ সেলসিয়াস]।

একে লাল দৈত্য বলার কারণ উষ্ণতা কম থাকায় এর আলো লালচে আর আকার অতি বৃহৎ, ব্যাস সূর্যের ব্যাসের দশ থেকে পাঁচশ গুণ। এর ঘনত্বও খুব কম, পৃথিবীর যে কোন শূন্যস্থানের ঘনত্বের চেয়েও কম। লাল দৈত্য থেকে তিনরকম নক্ষত্রের সৃষ্টি হতে পারে— শ্বেত বামন, নিউট্রন তারা ও ব্ল্যাক হোল। প্রথম দিকে যখন লাল দৈত্যের উষ্ণতা বেশী থাকে তখন একে বলে নীল দৈত্য (Blue giant) কারণ উষ্ণতা বেশী থাকায় এ নীলাভ আলো বিকিরণ করে। উষ্ণতা কমে যাওয়ায় নীল দৈত্য শীঘ্রই লাল দৈত্যে পরিণত হয়।

মাধ্যাকর্ষণজনিত অত্যন্ত চাপের ফলে লাল দৈত্যের কোরের উষ্ণতা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে দশ কোটি ডিগ্রি কেলভিনে পৌছালে আবার তাপনিউক্লিয় বিক্রিয়া সুরু হয়। এতে তিনটি হিলিয়াম কেন্দ্রক একটি কার্বন কেন্দ্রকে সংযোজিত হয়। একে বলে ত্রয়ী আলফা পদ্ধতি (Triple α proocess) কারণ আলফাকণা হোল হিলিয়াম কেন্দ্রক। যে সব লাল দৈত্যের

ভর খুব বেশী তাদের ক্ষেত্রে এর পর কার্বনের কেন্দ্রক থেকে অন্যান্য মৌলিকও সৃষ্টি হয় যেমন অক্সিজেন, গন্ধক, সিলিকন, লোহা ইত্যাদি।

তাপ নিউক্লিয় বিক্রিয়া শেষ হয়ে এলে যে সব লাল দৈত্যের ভর সূর্যের ভরের 1·4 গুনের কম তারা পরিণত হয় শ্বেত বামনে (White dwarf), যাদের ভর সূর্যের 1·4 গুন থেকে তিন গুণ তারা পরিণত হয় নিউট্রন তারায় (Newtron star) আর যাদের ভর সূর্যের তিন গুণেরও বেশী তারা পরিণত হয় ব্ল্যাক হোলে (Black whole)।

তাপ-নিউক্লিয় বিক্রিয়ার অবসানে মহাকর্ষের চাপে লাল দৈত্যের কেন্দ্র সঙ্কুচিত হয়। এতে কেন্দ্রের ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং মহাকর্ষের স্থিতিশক্তি তাপে রূপান্তরিত হওয়ায় কেন্দ্রের উষ্ণতাও বৃদ্ধি পায়। ফলে কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটে আর বাইরের গ্যাসীয় আবরণ প্রসারিত হয়ে ক্রমশঃ মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়। এর ফলে যে সব লাল দৈত্যের ভর সূর্যের ভরের 1·4 গুনের কম তারা পরিণত হয় সাদা বামনে।

মহাকর্ষের প্রভাবে সঙ্কুচিত হওয়ায় এবং বহির্ভাগ ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ায় শ্বেত বামনের আয়তন হয় খুব ছোট, প্রায় পৃথিবীর সমান কিন্তু উষ্ণতা খুব বেশী বলে এর আলো সাদা, এই জন্যই একে শ্বেত বামন বলে। এদের ঘনত্ব কিন্তু অত্যন্ত বেশী, জলের চেয়ে প্রায় দশ লক্ষ গুণ ভারী। শ্বেত বামন প্রায় সম্পূর্ণরূপে আয়নিত অর্থাৎ প্লাজমা অবস্থায় থাকে বলেই এর ঘনত্ব এত বেশী। তাপনিউক্লিয় বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নতুন করে আর কোন শক্তি সৃষ্টি হয় না ফলে শ্বেত বামন ধীরে ধীরে তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা আর অন্ধকার হয়ে যায় তবে এতে সময় লাগে বহু কোটি বৎসর।

নিউট্রন নক্ষত্র প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিউট্রন দ্বারা গঠিত অর্থাৎ প্রচণ্ড চাপ ও উষ্ণতায় এর পরমাণুগুলির প্রোটন ও ইলেকট্রন মিলে নিউট্রনে পরিণত হয়েছে। এর ব্যাস 15 থেকে 20 কিলোমিটার আর ঘনত্ব শ্বেত বামনের চেয়েও বেশী, এক ঘন সেমির ভর প্রায় দশ কোটি টন!

নিউট্রন তারায় দুটি চৌম্বক মেরু আছে আর এর চৌম্বক ক্ষেত্র অতি শক্তিশালী। যেখানে পৃথিবী ও সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা (intensity) প্রায় এক গস (gauss হল চৌম্বক তীব্রতার একক, এক গস=এক ডাইন/একক মেরু) এবং ভারী নক্ষত্রদের চৌম্বক তীব্রতা 100 থেকে 10000 গস সেখানে নিউট্রন নক্ষত্রের প্রায় 10^{13} গস। নিউট্রন তারা তীব্র বেগে (সেকেণ্ডে প্রায়

100 বার আবর্তন) আবর্তিত হয়। অনেকের ধারণা নিউট্রন তারার চারপাশে একটি প্লাজমার আবরণ আছে।

ব্ল্যাক হোল আরও ছোট এবং এর ঘনত্ব আরও বেশী বলে মহাকর্ষ বলও অত্যন্ত প্রবল ফলে এর কাছ দিয়ে যাওয়া সব বস্তু ও আলোকে এ নিজের দিকে টেনে নেয়। দেখা ও নাদেখা সব রকম আলোকেই সম্পূর্ণরূপে শুষে নেয় বলে ব্ল্যাক হোল সম্পূর্ণ কালো ও একেবারেই অদৃশ্য। তবে এর মহাকর্ষের প্রভাবে নিকটের কোন বস্তুর বেগের বা সেই বস্তু থেকে নির্গত বিকিরণের কোন পরিবর্তন হলে তা থেকে ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। ব্ল্যাক হোল এখনও একটা মস্ত বড় রহস্য।

এ প্রসঙ্গে মনে রেখ সূর্যের ভর $= 1{\cdot}989 \times 10^{33}$ গ্রাম, সূর্যের দেখা আলোক শক্তির বিকিরণের হার সেকেণ্ডে $3{\cdot}90 \times 10^{33}$ আর্গ।

নক্ষত্রদের ভর সাধারণতঃ সূর্যের 1/10 অংশ থেকে 50 গুন। তারাদের বিকিরিত শক্তি সূর্যের বিকিরিত শক্তির 1/100 অংশ থেকে দশ লক্ষ গুন।

৮৭। পালসার ও কোয়াসার কাকে বলে?

পালসার (Pulsar) হল তীব্রবেগে ঘূর্ণমান নিউট্রন নক্ষত্র যা সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে (1/30 সেকেণ্ড হতে কয়েক সেকেণ্ড) বেতার তরঙ্গ, এক্স রশ্মি বা আলোক তরঙ্গ বিকিরণ করে। পালসার আবিষ্কৃত হয় 1967-68 সালে।

কোয়াসারকে (Quasar) আগে বলা হোত তারকাসদৃশ বস্তু (Quasi-steller object) কারণ এরা ঠিক নক্ষত্র নয় কিন্তু অনেকটা নক্ষত্রের মত। এরা সৌরজগৎ থেকে বহুদূরে অবস্থিত, দূরত্ব 16 বিলিয়ন থেকে 18 বিলিয়ন আলোকবর্ষ। এদের ব্যাস প্রায় এক আলোকবর্ষ। এদের উজ্জলতা অনিয়মিত ভাবে কমে বাড়ে। এরা প্রচণ্ড বিকিরণের উৎস। আয়তনে গ্যালোক্সির চেয়ে অনেক ছোট হলেও কোয়াসারের বিকিরিত শক্তির পরিমাণ একটি সম্পূর্ণ গ্যালাক্সির বিকিরিত শক্তির সমান এমন কি তার চেয়েও বেশী। এদের আলো লালচে।

কোয়াসার আবিষ্কৃত হয় 1960 সালে। এর একটি বৈশিষ্ট্য হল তীব্র অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণ। বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাবিশ্বের মোট কোয়াসার সংখ্যা দেড় কোটির মত তবে এই মুহূর্তে যারা কোয়াসার হিসাবে বেঁচে আছে তাঁদের সংখ্যা 35000 এর বেশী নয়। বাকিরা হয়ত ছোট খাটো গ্যালাক্সিতে

পরিণত হয়েছে। মনে রেখ আজ আমরা যে কোয়াসারের আলো দেখতে পাচ্ছি তা কোয়াসার থেকে রওনা হয়েছিল 16 থেকে 18 বিলিয়ন বছর আগে, এর মধ্যে অনেক কোয়াসারেরই মৃত্যু হয়েছে।

৮৮। নোভা ও সুপারনোভা কি ?

নোভা (Nova মানে নতুন) হল এমন নক্ষত্র বিস্ফোরণের ফলে যার উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের উজ্জ্বলতা কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন ধরে বৃদ্ধি পেয়ে মূল উজ্জ্বলতার প্রায় লক্ষ গুন পর্যন্ত হয়। তারপর আবার উজ্জ্বলতা হ্রাস পেতে পেতে কয়েক সপ্তাহ পরে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

সাধারণতঃ কোন লাল দৈত্যের কাছে কোন শ্বেত বামন থাকলে শ্বেত বামনের প্রচণ্ড মহাকর্ষের প্রভাবে লাল দৈত্য থেকে পদার্থ শ্বেত বামনের দিকে তীব্রবেগে ছুটে যায়। এতে পদার্থের কনায় কনায় সংঘর্ষ হয় আর বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়। ফলে উষ্ণতা কয়েক লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পরিণত হয়, আর নক্ষত্রের উজ্জ্বলতাও বৃদ্ধি পায়। এভাবেই নোভার উৎপত্তি হয় বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

আর অতিনোভা (Supernova) হল এমন নক্ষত্র প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে যার উজ্জ্বলতা হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের উজ্জ্বলতা কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন ধরে বৃদ্ধি পেয়ে মূল উজ্জ্বলতার দশকোটি গুন পর্যন্ত হতে পারে। উজ্জ্বলতা হ্রাস পেয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে এদের কয়েক মাস সময় লাগে। সুপারনোভা হল উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। এর আলোর পরিমাণ একটি সম্পূর্ণ গ্যালাক্সির আলোকেও হার মানতে পারে। কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও একে দেখা যায়।

অতিনোভা সাধারণতঃ যে কোন গ্যালাক্সিতে একশ বছরে একবার কি দুবার দেখা যায়। এদের ভর সচরাচর সূর্যের দুই তিন গুন হয়। নোভার বিস্ফোরণ ঘটে ধীরে ধীরে কিন্তু সুপারনোভার বিস্ফোরণ হয় হঠাৎ। অতিনোভার বিস্ফোরণেই নিউট্রন নক্ষত্র ও ব্ল্যাক হোলের সৃষ্টি হয়।

অতিনোভা অবশেষ হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকায় অনেক পুরানো বিস্ফোরণের অবশেষ এখনও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে অতিনোভার উল্লেখ আছে যেমন চীনদেশের ইতিহাসে 1054 সালে বৃষ রাশিতে একটি অতিনোভার আবির্ভাবের কথা পাওয়া যায়। বর্তমান কর্কট নেবুলা (Crab nebula) এই অতিনোভার অবশেষ।

অতিনোভা বিস্ফোরণের কারণ কি? যে সব নক্ষত্রের ভর সৌরভরের 1·4 গুণের বেশী তাদের মহাকর্ষও অতি প্রবল। ফলে তাপ নিউক্লিয় বিক্রিয়ার অবসানে মহাকর্ষের প্রচণ্ড চাপে তাদের কেন্দ্র শ্বেত বামনের চেয়ে অনেকে বেশী সঙ্কুচিত হয়। এতে তাদের কেন্দ্রের ঘনত্ব অত্যন্ত বেড়ে যায় আর মহাকর্ষজনিত স্থিতিশক্তি তাপশক্তিতে পরিণত হওয়ায় কেন্দ্রের উষ্ণতাও প্রচণ্ড বাড়ে। ফলে কেন্দ্রে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে আর বাইরের গ্যাসীয় আবরণ দ্রুতবেগে প্রসারিত হতে থাকে। গ্যাসের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় 5000 কিলোমিটার দাঁড়ায়। এই হল অতিনোভা বিস্ফোরণ।

সুতরাং প্রত্যেক অতিনোভার কেন্দ্রে আছে একটি ভারী অংশ আর তার চারপাশে একটি সম্প্রসারমান গ্যাসের আবরণ। নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 1·4 গুন থেকে তিনগুন পর্যন্ত হলে কেন্দ্রের ভারী অংশে পরিণত হয় নিউট্রন নক্ষত্রে আর তার ভর সৌরভরের তিন গুনের বেশী হলে কেন্দ্র পরিণত হয় ব্ল্যাক হোলে সুতরাং অতিনোভা বিস্ফোরণের জন্য নক্ষত্রের ভর সৌরভরের 1·4 গুণের বেশী হওয়া চাই। আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের নামে এই সীমাকে (সৌরভরের 1·4 গুন) বলে চন্দ্রশেখর সীমা (Chandrashekhar limit)।

অতিনোভা অবশেষের এই গ্যাসীয় আবরণ কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ বৎসর পর্যন্ত সক্রিয় থাকতে পারে। কিন্তু ভিতরের নিউট্রন তারাটি তারপরও কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে পালসার হিসাবে বেতার তরঙ্গ বা এক্স রশ্মি বিকিরণ করতে থাকবে।

হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মোট ভর মহাবিশ্বের ভরের প্রায় 92%, লোহা অপেক্ষা ভারী মৌলের 1% এরও কম। লোহা অপেক্ষায় ভারী মৌল সাধারণতঃ অতিনোভা বিস্ফোরণেই সৃষ্টি হয়।

৮৯। মহাজাগতিক রশ্মি কাকে বলে?

মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic ray) হল পৃথিবীর বাইরে থেকে আসা উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন পদার্থ কণা ও গামা রশ্মির সমবায়। মহাজাগতিক রশ্মিকে দুভাগে ভাগ করা যায়, প্রাথমিক (primary) ও গৌন (secondary)। যে রশ্মি বাইরে থেকে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তাকে বলে প্রাথমিক আর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে যে রশ্মির সৃষ্টি হয় আর যা ভূপৃষ্ঠে এসে

পৌঁছায় তা হল গৌণ। প্রাথমিক রশ্মির কণারা হোল প্রধানতঃ প্রোটন (হাইড্রোজেন কেন্দ্রক), এছাড়া অল্প পরিমাণে আছে ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রন, আন্টিপ্রোটন ও বিভিন্ন মৌলের কেন্দ্রক। কণাদের বেগ প্রায় আলোর বেগের সমান।

প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মিরা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর তাদের মধ্যে কম শক্তি সম্পন্নরা বিক্ষিপ্ত হয় ও বেশী শক্তি সম্পন্নরা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। এরা বায়ুর পরমাণুগুলিকে আয়নিত করে, এভাবে গৌণ মহাজাগতিক রশ্মির সৃষ্টি হয়। গৌণ রশ্মি দুরকম, কঠিন ও কোমল। যার অন্য পদার্থকে ভেদ করার ক্ষমতা বেশী তা হোল কঠিন (hard) আর যার ভেদ করার ক্ষমতা কম তাকে বলে কোমল (soft)। সাধারণতঃ যা 10 সেমি পুরু সীসার পাতকেও ভেদ করতে পারে তাকে কঠিন আর যা পারে না তাকে কোমল রশ্মি বলা হয়। কঠিন রশ্মির প্রধান উপাদান মিউ মেসন ও কোমলের ইলেকট্রন, পজিট্রন ও গামা রশ্মি।

প্রাথমিক রশ্মির কণাদের শক্তি 10^9 থেকে 10^{20} ইলেকট্রন ভোল্ট। আর গামা ফোটনের শক্তি 10^8 থেকে 10^{13} ইলেকট্রন ভোল্ট।

মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তিস্থল নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে, উৎপত্তিস্থল সৌরজগৎ হতে পারে, আমাদের এই ছায়াপথ হতে পারে, এমন কি অন্য কোন গ্যালাক্সিও হতে পারে। তবে মহাজাগতিক রশ্মির একটি বড় উৎস হল সিগনাস এক্স 3 (Cygnus X 3) নক্ষত্র। সিগনাস নক্ষত্রপুঞ্জে এক্স রশ্মি বিকিরণকারী নক্ষত্রগুলির মধ্যে এক্স রশ্মির প্রাবল্যের বিচারে এর স্থান তৃতীয়।

মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তির কারণ কি? বিজ্ঞানীরা মনে করেন বিভিন্ন উৎস থেকে মহাজাগতিক রশ্মির কণারা শক্তি লাভ করে এবং এই শক্তিই তাদের প্রচণ্ড বেগের কারণ। মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কার করেন অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ভিক্টর হেস (Victor Hess) 1912 সালে।

৯০। মহাজাগতিক রশ্মির শাওয়ার কি?

অনেক সময় দেখা যায় মহাজাগতিক রশ্মির একটি প্রাথমিক কণা থেকে লক্ষ লক্ষ গৌণ কণার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথমে একটি প্রাথমিক কণার সঙ্গে বায়ুর

পরমাণুর সংঘর্ষে কয়েকটি কণার সৃষ্টি হয়, পরে এই কণাদের সঙ্গে অন্য বাতাসের পরমাণুর সংঘর্ষে ও তাদের নিজেদের বিক্রিয়ায় আরও অসংখ্য কণার উৎপত্তি হয়। এই গৌণ কণাগুলি মূল কণার পথের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। একে বলে কসমিক রে শাওয়ার (Shower)।

৯১। ভ্যান অ্যালেন বলয় কাকে বলে ?

মহাজাগতিক রশ্মির প্রাথমিক কণারা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে অল্পশক্তিসম্পন্ন কণারা চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ক্রমাগতঃ ঘুরপাক খেতে থাকে ; এরা পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌছাতেও পারে না আবার চৌম্বক ক্ষেত্রের বাইরেও চলে যেতে পারে না। এরা পৃথিবীর চারপাশে যে অঞ্চলে ঘুরপাক খায় আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী ভ্যান অ্যালেনের নামানুসারে তাকে বলে ভ্যান অ্যালেন বলয় (Van Allen Belt)। এই বলয়ের বিস্তার পৃথিবীর দুই চৌম্বক মেরুর দিকে সবচেয়ে কম আর নিরক্ষরেখা অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী।

৯২। মহাকাশের রেডিও তরঙ্গ ও এক্স রে উৎস কি ?

আগে শুধু দেখা আলোর মাধ্যমেই মহাবিশ্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল কিন্তু 1931 সালে ইয়ানস্কির মহাশূন্যের বেতার তরঙ্গ (Radio wave) আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে না-দেখা আলোর সাহায্যে মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনের পথ খুলে যায়।

মহাশূন্যের না-দেখা আলোর মধ্যে প্রধান হল রেডিও তরঙ্গ, এক্স রশ্মি, অণুতরঙ্গ (Microwave) ও গামা রশ্মি।

মহাশূন্যের বেতার তরঙ্গ ধরা হয় বেতার দূরবীণের (Radio Telescope) সাহায্যে। এ হল বেতার তরঙ্গ ধরার উপযোগী কতকগুলি অ্যান্টিনা (antenna) দ্বারা গঠিত বাটির মত। এই বাটির ব্যাস 50 থেকে 100 মিটার ও গভীরতা 15—25 মিটার। বাটিকে ইচ্ছামত ঘোরাবার ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশে নীলগিরির কাছে উটিতে একটি শক্তিশালী রেডিও দূরবীণ বসানো হয়েছে।

আমাদের গ্যালাক্সি ও অন্য গ্যালাক্সিতে অনেক রেডিও উৎস আছে। অনেক অতিনোভা অবশেষ ও কোয়াসার ভাল রেডিও উৎস। সিগনাস নক্ষত্রপুঞ্জে একটি শক্তিশালী রেডিও উৎস আছে, এর বেতার তরঙ্গে শক্তি বিকিরণের হার

সেকেণ্ডে 5×10^{44} আর্গ এবং দূরত্ব 17 কোটি পারসেক। আমাদের মত সাধারণ গ্যালাক্সির রেডিও বিকিরণ ক্ষমতা সেকেণ্ডে প্রায় 10^{38} আর্গ।

তাপ-নিউক্লিয় বিক্রিয়ার অবসানে নক্ষত্রের কেন্দ্রে সাধারণ বা অতিনোভা বিস্ফোরণই এই রেডিও বিকিরণের কারণ।

মহাকাশের আলো ও বেতার তরঙ্গ মাটিতে বসানো আলোক ও রেডিও দূরবীণের সাহায্যে ধরা যায় কারণ বায়ুমণ্ডল এসব তরঙ্গকে বাধা দেয় না। কিন্তু এক্স রশ্মির পক্ষে এভাবে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌছান সম্ভব হয় না কারণ বায়ুমণ্ডল এক্স রশ্মিকে শোষণ করে। এজন্য বায়ুমণ্ডলের উর্ধে উঠে পরীক্ষা না করলে এক্স রে উৎসগুলি সম্বন্ধে জানা যায় না। সুতরাং এদের সম্বন্ধে জানতে হলে বেলুন, রকেট বা কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নিতে হয়। সর্বপ্রথম 1962 সালে নিউ মেক্সিকোয় রকেটের সাহায্যে বৃশ্চিক রাশি, সিগনাস নক্ষত্রপুঞ্জ ইত্যাদিতে মহাকাশের এক্স রে বিকিরণের অস্তিত্ব জানা যায়।

আমাদের গ্যালাক্সিতে অনেক এক্স রে উৎস আছে, এদের মধ্যে শক্তিশালীরা (সংখ্যায় প্রায় বারটি) আছে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের কাছে, যাদের প্রত্যেকের এক্স রশ্মি বিকিরণের হার সেকেণ্ডে প্রায় 10^{38} আর্গ। বাকিরা আছে গ্যালাক্সির পেঁচানো বাহুতে যাদের প্রত্যেকের এক্স রে বিকিরণের হার সেকেণ্ডে 10^{36} আর্গের মত। আমাদের গ্যালাক্সির মোট এক্স রে বিকিরণের হার সেকেণ্ডে প্রায় 10^{39} আর্গ, দূরের কিছু গ্যালাক্সির বেলা এটা সেকেণ্ডে প্রায় 10^{44} আর্গ।

সাধারণতঃ মহাকাশে এক্স রে সৃষ্টি হয় অতিনোভা বিস্ফোরণে বা যুগ্মতারায়। অতিনোভা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শক্তির কিছু অংশই এক্স রে তে পরিণত হয়।

যুগ্মতারার ক্ষেত্রে এদের একটি হল নীল বা লাল দৈত্য ও অন্যটি সাধারণতঃ নিউট্রন তারা বা ব্ল্যাক হোল।

উদাহরণস্বরূপ এক্স রশ্মি উৎস সিগনাস X-3 সম্ভবতঃ একটি যুগ্মতারা যার একটি নিউট্রন তারা (বা ব্ল্যাক হোল)। এই নিউট্রন তারার প্রচণ্ড মহাকর্ষে সঙ্গী লাল দৈত্যের গ্যাস তার দিকে তীব্রবেগে ধাবিত হয়ে প্রথমে তার চারপাশে একটি ঘূর্ণমান বলয় সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত নিউট্রন তারার দুই চৌম্বক মেরুতে সজোরে এসে আঘাত করে। সংঘর্ষের ফলে এই গ্যাসের উষ্ণতা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়ে তা প্লাজমায় পরিণত হয় আর এই অত্যুষ্ণ প্লাজমা থেকেই সৃষ্টি হয় এক্স রশ্মি। এভাবে নিউট্রন তারার প্রচণ্ড চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে মহাজাগতিক রশ্মিও সৃষ্টি হয়।

নিউট্রন তারার বদলে ব্ল্যাক হোল থাকলেও অনুরূপ গ্যাসের বলয় সৃষ্টি হয়। ঘুরতে ঘুরতে এই গ্যাস বলয়ের ভিতরের অংশে প্রবেশ করলে তার পরমাণু, আয়ন ইত্যাদির পারস্পরিক সংঘর্ষে গ্যাসের উষ্ণতা প্রায় 10 কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়। ফলে এই গ্যাস প্লাজমায় পরিণত হয়ে এক্স রশ্মি সৃষ্টি করে। অদৃশ্য হলেও এভাবে যুগ্মতারায় এক্স রে বিকিরণের সাহায্যে ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব বোঝা যায়। এমন অনেক যুগ্মতারার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের একটি করে তারা অদৃশ্য, বিজ্ঞানীদের ধারণা এই অদৃশ্য তারাগুলি ব্ল্যাক হোল।

যুগ্মতারা নয় এমন একক নিউট্রন তারা বা ব্ল্যাক হোলের মহাকর্ষের প্রভাবেও দূরের বস্তুকণা থেকে তার চারপাশে গ্যাসের বলয় তৈরি হতে পারে। এভাবেও এক্স রে সৃষ্টি হতে পারে তবে তা হবে খুব দুর্বল।

অণুতরঙ্গ কিন্তু মহাবিশ্বের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে আছে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা মনে করেন মহাবিশ্ব সব দিকে সমানভাবে সম্প্রসারমান ও সামগ্রিক ভাবে মহাবিশ্বের কোন আবর্তন গতি নেই বা থাকলেও খুব কম।

বিজ্ঞানীদের আরও ধারণা প্রায় দশ বিলিয়ন বছর আগে একটি আদি আগ্নেয় গোলার বিস্ফোরণে এই সম্প্রসারমান মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়। একে বলে মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব (Big Bang Theory)। বিস্ফোরণের কারণ অজ্ঞাত তবে সেসময় এই গোলার উষ্ণতা ছিল এক হাজার বিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর বিস্ফোরণের দশ লক্ষ বছর পরে প্রথম অণু তরঙ্গের সৃষ্টি।

৯৩। মুক্তি বেগ কাকে বলে?

পৃথিবীর অভিকর্ষের জন্য কোন বস্তুকে ঊর্ধ্বে ছুঁড়ে দিলে কিছু উপরে উঠে তা আবার নীচে নেমে আসে। কিন্তু বস্তুর বেগ একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশী হলে তা আর নেমে আসবে না, পৃথিবীর অভিকর্ষ কাটিয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। যে সর্বনিম্ন বেগে ছুঁড়ে দিলে কোন বস্তু আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না তাকে বলে মুক্তি বেগ (Velocity of escape)।

পৃথিবী সাপেক্ষে যে কোন বস্তুর মুক্তি বেগ সেকেণ্ডে 11·19 কিলোমিটার। বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র সাপেক্ষে বস্তুর মুক্তি বেগ বিভিন্ন।

———